২০১৯

বাংলাদেশের শ্রম পরিস্থিতি ও শ্রম আইনসীতি

Safety & Rights

Promoting Safety, Enforcing Rights

বাংলাদেশের শ্রম পরিস্থিতি
ও
শ্রম অর্থনীতি
২০১৯

Diakonia
People Change the World

Safety & Rights
Promoting Safety, Enforcing Rights

বাংলাদেশের শ্রম পরিস্থিতি ও শ্রম অর্থনীতি ২০১৯

সংকলন, সম্পাদনা ও প্রকাশনা
সেইফটি এন্ড রাইটস সোসাইটি (এসআরএস)
১৪/২৩ বাবর রোড (৫ম তলা)
ব্লক-বি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭।
ফোন: +৮৮ ০২ ৯১১৯৯০৩-৪, +৮৮ ০১৯৭৪৬৬৬৮৯০
ই-মেইল : info@safetyandrights.org
ওয়েবসাইট : www.safetyandrights.org

প্রকাশকাল
জানুয়ারি ২০২০

স্বত্ব
সেইফটি এন্ড রাইটস সোসাইটি (এসআরএস)

আলোকচিত্র
ইন্টারনেট

দাম
১০০ টাকা

The State of Labour and Labour Economy of Bangladesh 2019

Documentation, Editing and Publication
Safety and Rights Society (SRS)
14/23 Babor Road (4th floor), Block B
Mohammadpur, Dhaka 1207
Tel: +88 02 9119903-4
Mobile: +88 01974 666890
Email: info@safetyandrights.org
Web: www.safetyandrights.org

Date of Publication
January 2020

Price
100 Tk.

Copyright
Safety and Rights Society (SRS)

ISBN : 978-984-34-7968-6

সূচি

সেইফটি এন্ড রাইটস-এর বক্তব্য: জলবায়ু পরিবর্তন শ্রমজীবীদের জীবনে নতুন চ্যালেঞ্জ হিসেবে হাজির হয়েছে	৫
শ্রম ও কর্মসংস্থান চিত্র ২০১৯: সারসংক্ষেপ	৭
পোশাক খাত: প্রবৃদ্ধি ও চাকুরিচ্যুতি উভয়ই বাড়ছে	১০
পোশাক খাত: শ্রমিকদের যৌন নিপীড়ন বিরোধী আন্দোলন	১২
পোশাক খাত: সাক্ষাৎকার- 'বঞ্চনার প্রতিকার না পেয়েই কেবল শ্রমিকরা রাস্তায় নামে'	১৪
বাজেট ২০১৯-২০-এ শ্রম খাতের প্রাপ্তি: মন্ত্রণালয়ভিত্তিক বরাদ্দের তালিকায় সবচেয়ে নীচে শ্রম ও কর্মসংস্থান	১৬
নির্মাণ খাত: দুর্ঘটনা কমছে না; পরিদর্শন শুরু হচ্ছে	১৯
নির্মাণ খাত: 'শ্রমিকদের মাঝে ক্যানসার ও কিডনি রোগের প্রাদুর্ভাব বাড়ছে'	২১
শ্রম আদালতে মামলার পাহাড়	২২
দেশব্যাপী কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের কার্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ	২৪
চামড়া খাত: হাজার হাজার শ্রমিকের শিল্প নগরীতে চিকিৎসা সুবিধা নেই; নেই আবাসনের ব্যবস্থা	২৭
পাট শিল্প: খালিশপুর শ্রমিকদের লাগাতার আন্দোলন, জয়, পরাজয়, হতাশা	৩১
পরিকল্পনা কমিশনের সমীক্ষা: 'ছদ্মবেকার' এক কোটি পঁচিশ লাখ; অপর এক কোটি ৩৮ লাখ কাজ নিয়ে 'অসন্তুষ্ট'	৩৩
কর্মসংস্থান চিত্র: কাজের খোঁজে বেকারদের খরচ বিপুল	৩৬
বৈদেশিক কর্মসংস্থান খাত: প্রতিদিন ১১ জন প্রবাসী শ্রমিক লাশ হয়ে দেশে ফিরছে	৩৮
বৈদেশিক কর্মসংস্থান খাত: মরিয়া হয়ে ইউরোপ যাওয়ার চেষ্টা অব্যাহত; সুযোগ বেড়েছে জাপানে যাওয়ার	৪০
শ্রম ও কর্মসংস্থান খাতে পরিবর্তন ধারা: জলবায়ু পাল্টাচ্ছে কর্ম পরিবেশ, অর্থনীতি ও স্থানীয় জনমিতি	৪২
শ্রমজীবীদের পেশাগত সংকট: ইট ও পাথরভাঙ্গা শ্রমিকদের মাঝে সিলিকোসিসের প্রাদুর্ভাব	৪৪
চালকল শ্রমিকদের মধ্যে বেকারত্ব বাড়ছে	৪৬
অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত: রিকসা বন্ধের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের আন্দোলন	৪৮
পরিবহন খাত: নতুন সড়ক আইনের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের প্রতিবাদ অব্যাহত	৫০
জাহাজ ভাঙ্গা: শিল্পের পরিসর বাড়ছে; শ্রমিক সুরক্ষার অবস্থা আগের মতোই	৫২
চা শিল্প: শোষণমূলক শর্তেই বাগানে পড়ে থাকতে হয় শ্রমিকদের; উৎপাদনে রেকর্ড, কিন্তু মজুরি সামান্য	৫৪
শ্রমিক কল্যাণ তহবিল: একটি ভালো উদ্যোগের সুফল পাচ্ছে না শ্রমিকরা	৫৭
Labor and Employment Scenario 2019: A Summary	৫৯

সেইফটি এন্ড রাইটস-এর বক্তব্য

জলবায়ু পরিবর্তন শ্রমজীবীদের জীবনে নতুন চ্যালেঞ্জ হিসেবে হাজির হয়েছে

পরপর তৃতীয় বছরের মতো 'শ্রমচিত্র' প্রকাশিত হচ্ছে। আমাদের ক্ষুদ্র এই প্রচেষ্টা যে পরিকল্পনা অনুযায়ী, সময়সূচি মেনে সকলের হাতে পৌঁছাচ্ছে সেটা তৃপ্তির বিষয় বটে। কিন্তু দেশের শ্রম ও কর্মস্থানের ছবিটি খুবই অসন্তোষজনক। অতৃপ্তিকর।

বাংলাদেশ অর্থনৈতিকভাবে এগোচ্ছে– এটা সবাই জানি আমরা। তার বাজেটের আকার বাড়ছে। জিডিপি বাড়ছে। সুউচ্চ ভবন বাড়ছে। কলকারখানা বাড়ছে। আমদানি-রপ্তানি বাড়ছে। কিন্তু যা বাড়ছে না তাহলো শ্রমজীবীদের জীবনমান; তাদের কর্মসন্তুষ্টি; তাদের অধিকারের বাস্তবায়ন।

দেশের জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশই শ্রমজীবী-কর্মজীবী। বাংলাদেশ আয়তনে ছোট দেশ হলেও সংখ্যার হিসাবে তার শ্রমজীবী লোকসংখ্যার আকার বেশ বড়ো। বৈশ্বিক উৎপাদন ও ভোগ চক্রের অন্যতম শক্তি এই জনসংখ্যা। কিন্তু দেশটির নীতিনির্ধারণী স্তরে, অর্থনৈতিক সুশাসন চেষ্টায়, রাজনৈতিক অধিকারে কোটি কোটি শ্রমজীবী ক্রমে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। যা খুব বিস্ময়কর। তাদের সঙ্গে উপরতলার ১% মানুষের ব্যবধান বাড়ছে।

এটা জাতীয়ভাবে বিপদজনক ও ক্ষতিকর। দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের যে দীর্ঘ সংগ্রাম চলছে, অর্থনৈতিকভাবে উন্নত দেশ হওয়ার জন্য বাংলাদেশের যে স্বপ্ন রয়েছে– তা কোটি কোটি শ্রমজীবীকে দারিদ্র্য অবস্থায় রেখে কীভাবে সফল হতে পারে? কোটি কোটি শ্রমজীবী যদি অর্থনৈতিক বঞ্চনা, পেশাগত মর্যাদা ও রাজনৈতিক অধিকারহীন থাকে তাহলেও বাংলাদেশের 'উন্নত' হওয়ার তৃপ্তি প্রশ্নবিদ্ধই থেকে যাবে।

সেইফটি এন্ড রাইটস এই অবস্থা বদলাতেই কাজ করছে। আমরা এমন এক অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজের জন্য কাজ করি– যেখানে শ্রমজীবীরাও জাতীয় জীবনের সুখী অংশীদার হবে। তারা বিদ্যমান শ্রম অধিকার অনুযায়ী মর্যাদা পাবে এবং দেশের ক্রমবর্ধমান 'উন্নতি'রও হিস্যাধারী হবে। দেশ ও সমাজের শান্তি ও স্থিতিশীলতার স্বার্থেই এটা খুব জরুরি। সেইফটি এন্ড রাইটস এই অর্থে বাংলাদেশে শান্তি ও স্থিতিশীলতার জন্যই কাজ করছে। কোটি কোটি নাগরিককে অন্যায্য, অসচ্ছল ও অসন্তুষ্ট রেখে নিশ্চয়ই আমরা একটা স্থিতিশীল সমাজের কথা ভাবতে পারি না।

কিন্তু বাংলাদেশের শ্রমজীবীরা ঠিক যে পরিস্থিতির মধ্যদিয়ে বছর পার করছে– তা বেশি সন্তোষজনক নয়। বাৎসরিক শ্রমচিত্রে আমরা সেটাই দেখছি। একদিকে সামান্য কিছু অগ্রগতি, অন্যদিকে বিপুল বঞ্চনা। প্রতিবছর এরকম একটা পরিস্থিতির মধ্যদিয়েই এগোতে হচ্ছে বাংলাদেশের শ্রমিকদের। বিগত দু বছরের মতোই সর্বশেষ ২০১৯-এও আমরা সেটাই দেখেছি।

কেবল গত তিন বছরের অভিজ্ঞতার সারসংকলন করে আমরা দেখছি, কৃষি খাত বাদে দেশের প্রধান প্রধান অর্থনৈতিক খাতের ইতিবাচক বিকাশ ঘটেছে। তৈরি পোশাক খাত, চা, নির্মাণ, চামড়া ইত্যাদি খাতের মোটেই কোন সংকোচন দেখছি না আমরা। বরং উল্টোটিই সত্য। পাশাপাশি দেশের আনাচে কানাচে আরও অনেক ধরনের শিল্প অর্থনীতির অভ্যুদয় ঘটছে। ফলে শ্রমিক সংখ্যাও বাড়ছে। তবে কাজ প্রত্যাশী তরুণ-তরুণীর সংখ্যা যেভাবে বাড়ছে সেভাবে কাজের সুযোগ তৈরি হচ্ছে না। এভাবে ক্রমে বেকারত্ব বড় এক সমস্যা হিসেবে তৈরি হচ্ছে। দেশের শ্রম অর্থনীতির বড় এক দিক হলো শিক্ষিত বেকারদের ক্রমস্ফীতি। গত দুটি শ্রম চিত্রের মতোই এবারও বিষয়টি সংকলিত করা হয়েছে। কারণ এই পরিস্থিতি উদ্বেগজনক।

অন্যদিকে, তৈরি পোশাক, চামড়া, চা ইত্যাদি রপ্তানিপ্রধান শিল্পের ক্ষেত্রে শ্রমিক অধিকারের ক্রমবর্ধমান ক্ষয় নিয়েও আলোকপাত করা হয়েছে এবারের শ্রমচিত্রে। বিশেষ করে তৈরি পোশাক খাতে গত বছর বিপুল সংখ্যক শ্রমিক ছাঁটাইয়ের শিকার হয়েছে। যদিও এই খাতের রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ও আকারগত বিস্তৃতি বিপুল কিন্তু শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ হওয়া, পেশাগত বঞ্চনার কথা বলার সুযোগ অত্যন্ত কমে যেতে দেখেছি আমরা। বলা যায়, এই খাতে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে রাষ্ট্রীয় বিধি-বিধান মেনেও ট্রেড ইউনিয়নরূপী কর্মকান্ড পরিচালনা এখন অতি দুরূহ।

চামড়া ও চা শিল্পে যদিও শ্রমিক সংগঠনগুলো তাদের পেশাগত বিষয়ে কথা বলতে পারছে– কিন্তু সেখানেও প্রাপ্তি অতি কমই দেখা যাচ্ছে। ২০১৯-এও বাংলাদেশের চা শ্রমিকরা দৈনিক ১০২ টাকা মজুরিতে চাকুরি করে যাচ্ছেন, যখন বাজারে এক কেজি পেয়েজের দাম ২৫০ টাকা পর্যন্ত দেখা গেছে, যখন অন্যান্য প্রায় সকল নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দামও

ক্রমবর্ধমান– এটা বেশ বিস্ময়কর। নির্মমও বটে।

চামড়া খাতেও সর্বশেষ বছরে শ্রমজীবীদের বিশেষ কোন অর্জন নেই। যদিও সেখানে বিশাল চামড়া শিল্প নগরী হয়েছে–কিন্তু তাতে শ্রমিকদের জন্য গড়ে উঠেনি কোন চিকিৎসালয় কিংবা আবাসন ব্যবস্থা। এ এক অবিশ্বাস্য শিল্প ব্যবস্থাপনা। জাহাজ ভাঙ্গা শিল্পেও পরিস্থিতি অনুরূপ। তার পরিসর বাড়ছে- শ্রমিক নিরাপত্তা নয়।

কারখানায় ভালো উৎপাদনের স্বার্থেই যে শ্রমিকদের যাতায়াত, চিকিৎসা সেবা ও আবাসন সুবিধা থাকা উচিত– এই বোধ এখনও বাংলাদেশের উদ্যোক্তা শ্রেণীর মাঝে গুরুত্ব পায়নি। এসব বিষয়ে সরকারের উদ্যোগ ও চাপ থাকা দরকার। এখাতে প্রাইভেট-পাবলিক অংশীদারিত্বও হতে পারে। সেইফটি এন্ড রাইটস বিগত বছরগুলোতে বাজেটকালে এ প্রসঙ্গে যেসব প্রচার আন্দোলন চালিয়েছে বাজেটে তার উল্লেখযোগ্য কোন প্রতিফলন ঘটেনি। আমাদের প্রচার আন্দোলনের ব্যর্থতার চেয়েও এটাকে আমরা একটা জাতীয় ব্যর্থতা হিসেবেই দেখি। এবারের শ্রমচিত্রেও আমরা বাজেটে শ্রমজীবীদের প্রাপ্তির বিষয়ে পৃথকভাবে আলোকপাত করেছি।

আগামীতেও আমরা বাৎসরিক শ্রমচিত্র তৈরির এই কাজটি অব্যাহত রাখতে চাই। বিগত বছরগুলোতে আমরা কর্মসংস্থান ও সাংগঠনিক সংকটের দিকে যেভাবে গুরুত্ব দিয়ে তথ্য-উপাত্ত সংকলন করেছি সেটা অব্যাহত রাখার পাশাপাশি আগামীতে আমরা কাজ করতে চাইছি বিশেষভাবে জলবায়ু উদ্বাস্তুদের নিয়ে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে দেশের শ্রমজীবীদের বৃহৎ এক অংশ অনেক ধরনের সমস্যায় পড়ছেন। একদিকে পুরানো কর্মস্থল হারানো, অন্যদিকে নতুন করে কাজের সুযোগ পেলেও বসতি সংক্রান্ত সংকটে হাবুডুবু খেতে হচ্ছে এইরূপ লাখ লাখ মানুষকে। এটা বাংলাদেশের সামনে নতুন এক সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ হিসেবে হাজির হয়েছে। সেইফটি এন্ড রাইটস মনে করছে– আবহাওয়াগত পরিবর্তনের কারণে সংকটের মুখে পড়া বাংলাদেশের এই নতুন শ্রমজীবী গোষ্ঠীর বিষয়টি জাতীয় পরিসরে এইমুহূর্তে বাড়তি মনযোগ দাবি করছে।

সকলকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা। আশা করি, ২০২০ সালে শ্রম অধিকারের ক্ষেত্রে কিছু ইতিবাচক পরিবর্তন দেখা যাবে।

সেকেন্দার আলী মিনা
সেইফটি এন্ড রাইটস সোসাইটি, বাংলাদেশ।

শ্রম ও কর্মসংস্থান চিত্র ২০১৯
সারসংক্ষেপ

এক.

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে শ্রমিকরা চালকের আসনেই আছে। এটা প্রশ্নাতীত। কিন্তু সমাজে ও সমাজের নীতিনির্ধারকদের আলাপ-আলোচনা-সিদ্ধান্তে শ্রমিকরা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র আকারে উপস্থিত নেই। এটা বিপজ্জনক এক স্ববিরোধিতা। কিন্তু এভাবেই চলছে বাংলাদেশ পুঁজির আদিম সঞ্চয়ন।

এটা অস্বাভাবিক নয়। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের দেয়া তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশের প্রথম সংসদে এমপিদের মধ্যে ব্যবসায়ী ছিলেন ১৭ শতাংশের মতো। দশম জাতীয় সংসদে তা দাঁড়ায় ৫৯ শতাংশে। সামাজিক সংগঠন 'সুজন' সূত্রে জানা গেছে, সর্বশেষ একাদশ জাতীয় নির্বাচনে শপথ নেওয়া সংসদ সদস্যদের ১৮২ জনই (৬১ দশমিক ৭ শতাংশ) পেশায় ব্যবসায়ী এবং শিল্পপতি।

অনুমান করা দুঃসাধ্য নয়, নীতিনির্ধারণী প্রক্রিয়ায় ঠিক উল্টো ধরনের পরিণতি ঘটেছে শ্রমিক-কৃষক প্রতিনিধিদের। তাঁদের উপস্থিতি কমে গেছে পার্লামেন্টে এবং অন্যান্য উচ্চতর পরিসরে। ফলে জাতীয় নীতিমালায়, আইনে, আইনের বাস্তবায়নে শ্রমিকদের স্বার্থ সামান্যই রক্ষিত হবে এটা ধরেই নেয়া যায়। এও তাই আশা করা যায় না, দেশের মানুষের গড় আয় যখন ১৯৫২ ডলার– তখন শ্রমিক পরিবারগুলোও সেরকম আয় করবে। বরং পরিসংখ্যান ব্যুরোর ২০১৬ সালের খানা জরিপের যে ফল ২০১৯-এ প্রকাশ হয়েছে তাতে দেখা গেছে, সমাজের নীচু তলার ৫ শতাংশের সঙ্গে উঁচু তলার ৫ শতাংশের আয়ের ব্যবধান ১১৯ গুন। বেসরকারি হিসাবে এই ব্যবধান আরও বেশি। তাই ব্যবধান বৃদ্ধি অব্যাহত আছে।

প্রকৃতির নিয়মে এবং অর্থনীতির বাস্তবতায় শ্রমিক জনগোষ্ঠীর সংখ্যাও দেশে বেড়েই চলেছে। আবার বাংলাদেশের শ্রমিকরা দেশের সীমান্তের বাইরেও বাড়ছেন। বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় বা জিডিপি অর্জনে শিল্পের অবদান ৩৩ দশমিক ৭১ শতাংশ, যার প্রকৃত শক্তি হচ্ছে এ দেশের শ্রমজীবীরাই। কমবেশি প্রায় ছয় কোটি মানুষ শ্রম বিক্রি করে চলছে এখন। প্রতিবছর প্রায় ২০ লাখ মানুষ নতুন করে এই শ্রমবাজারে প্রবেশ করছে। এর মধ্যে অদক্ষ কিংবা ন্যুনতম কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত শ্রমশক্তির সংখ্যাই বেশি। এছাড়া উচ্চশিক্ষিত ও মধ্যম শিক্ষিত শ্রমশক্তিও রয়েছে। কারিগরি ও মধ্যম পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষিতরা কাজের সংস্থান করতে পারলেও উচ্চ শিক্ষিতের বড় অংশ রয়ে যাচ্ছে বেকার। বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান ২০১৯-এর ডিসেম্বরে তাদের এক গবেষণা উপস্থাপন করে জানিয়েছে শিক্ষিত জনশক্তির প্রায় ৪৮ শতাংশ পূর্ণকালীন কাজ করছেন। প্রায় ১৮ শতাংশ খন্ডকালীন কাজে নিয়োজিত। কিন্তু ৩৩ শতাংশ বেকার হয়ে আছে। বেকারদের কাজ পাওয়ার নিত্য সংগ্রামের কষ্টকর আর্থিক দিকটি নিয়ে একটি প্রতিবেদন রয়েছে এই সংকলনে।

দুই.

শ্রমের ক্ষেত্র বাংলাদেশে মূলত 'ফরমাল' ও 'ইনফরমাল' দুই ভাগে বিস্তৃত। ফরমাল খাতের পরিসর ছোট। ফরমাল খাতে সরকারি নজরদারি বা রাষ্ট্রীয় নীতিমালা আছে কিছু। তার কিছু বাস্তবায়নও আছে। শ্রমিকরা সেখানে অন্তত একটা নিয়োগপত্র পাচ্ছে। সে কারণেই ঐ সব প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের জীবনমান কিছুটা উন্নত বা সুরক্ষিত।

অন্যদিকে, ইনফরমাল খাতের শ্রমিক-কর্মচারীদের জীবনমান সম্পূর্ণভাবে মালিকদের মর্জির ওপর নির্ভরশীল হয়ে আছে। রাজনৈতিক প্রভাব ও সম্পদের প্রভাবে মালিকেরা আইনকানুনের তোয়াক্কা করেন কম। এরকম অসম পরিস্থিতির মাঝেই প্রতিবছর শ্রমবাজারে যুক্ত হচ্ছে লাখ লাখ নতুন শ্রমিক। এই সহজলভ্যতা বা শ্রমিক আধিক্যের সুযোগে কম মূল্যে শ্রম লুফে নিচ্ছে মালিকপক্ষ, কমে যাচ্ছে শ্রমের মূল্য। লংঘিত হচ্ছে শ্রমিক অধিকার। শ্রমজীবীদের পছন্দের সুযোগ। এমনকি অধিকার নিয়ে কথা বলার অধিকারও। ২০১৯ সেই অর্থে বাংলাদেশের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে একটা 'শান্ত-শিষ্ট বছর' হিসেবেই লিখিত হয়ে থাকবে ইতিহাসে। সাক্ষাৎকারে সংগঠকরা ব্যতিক্রমহীনভাবে সকলেই বলেছেন, 'শ্রমিকদের পেশাগত অধিকার নিয়ে নিয়মতান্ত্রিকভাবে আন্দোলন-সংগ্রামকে এখন দেখা হচ্ছে দেশকে অস্থিতিশীল করার ষড়যন্ত্র হিসেবে।' অর্থাৎ ২০১৯-এ শ্রমিক অঙ্গনের স্থিতিশীলতাকে কার্যত শ্রমিকদের চুপচাপ থাকার বাধ্যবাধকতা হিসেবেই গণ্য করা যায়। শিল্পখাতে 'শান্তি-শৃঙ্খলা'র জন্য নতুন যে রক্ষীদল তৈরি হয়েছে তাদের নিয়েও শ্রমিকদের অভিজ্ঞতা সুখকর নয়।

তবে বছর জুড়ে প্রায় সকল খাতের মালিকদের সংগঠনগুলো তাদের আর্থিক স্বার্থ এবং প্রভাবের পরিসর বাড়াতে ব্যাপকভাবে সক্রিয় ছিল। মালিকরা তাদের চাওয়া-পাওয়ার কথা নির্বিঘ্নেই বলতে পেরেছেন এবং সন্তোষজনকভাবে রাষ্ট্রের কাছ থেকে

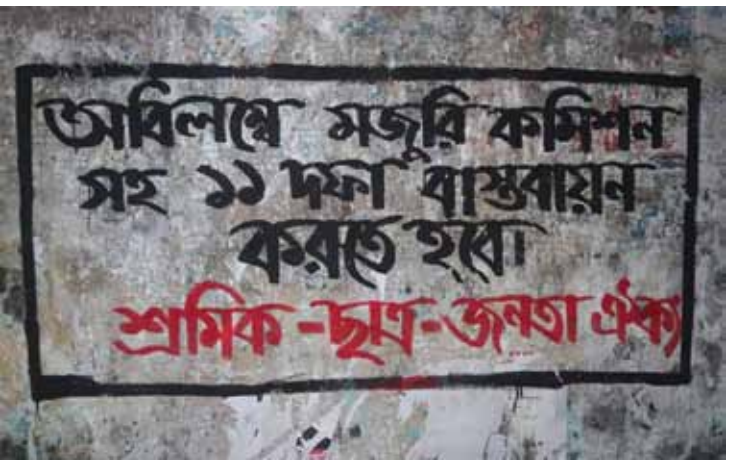

২০১৯-এ খুলনার খালিশপুরে দেয়াল লিখন

দাবি-দাওয়া আদায় করতে পেরেছেন। বিভিন্ন শিল্পখাতের জন্য রাষ্ট্রীয় প্রণোদনাও অব্যাহত ছিল। পোশাক খাতের জন্য ২০১৯-২০ অর্থবছরের বাজেটে প্রণোদনা হিসেবে দুই হাজার ৮২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। অক্টোবরে চামড়া খাতের প্রণোদনা আরও পাঁচ বছর অব্যাহত রাখার ঘোষণা দেন খোদ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। তবে এসব প্রণোদনা সংশ্লিষ্ট খাতগুলোর শ্রমিকদের জন্য বিশেষ কোন সুবিধা করে দিয়েছে কি না বা প্রণোদনার কোন হিস্যা শ্রমিকরাও পাচ্ছে কি না– সে বিষয়ে কোথাও কোন তথ্য পাওয়া যায় না। বরং এই সংকলনের একাধিক প্রতিবেদন থেকে আমরা দেখবো চামড়া খাতে কিংবা পোশাক খাতে ২০১৯-এও শ্রমজীবীদের জীবনযুদ্ধে কোন স্বস্তি আসেনি।

তিন.

বাংলাদেশের বিদ্যমান শ্রমজীবীদের একাংশ দেশের বাইরেও রয়েছেন। এই প্রবাসী শ্রমিকরাও জিডিপিতে অবদান রাখছেন পরোক্ষে। বিগত বছরে তাদের দুর্দশার কথা, বিদেশের মাটিতে লাঞ্ছনার কথা, চাকুরিস্থল থেকে উৎখাত হলে – কখনো কখনো লাশ হয়ে দেশে ফেরার ঘটনা বারবার প্রচার মাধ্যমে এসেছে। এই সংকলনে অন্তত দুটি লেখায় প্রবাসী শ্রমিকদের বিপন্নতার কিছু চুম্বক দৃশ্য উঠে এসেছে।

বিদেশে বাংলাদেশি শ্রমিকের সংখ্যা কত– তার কোন নির্ভরযোগ্য হিসাব আমরা জানি না। কেউ বলেন ৮০ লাখ, কেউ বলেন ৯০ লাখ, কারও মতে ১ কোটি। বছরে গড়ে প্রায় আট লাখ মানুষ যাচ্ছেন কাজের সূত্রে। আবার ১-২ লাখ ফিরছেনও। এই বিপুলসংখ্যক শ্রমিক যেসব দেশে আছেন, তাঁরা কেবল সেখানকার অর্থনীতিতেই অবদান রাখছেন না–

২০১৯-এ কর্মক্ষেত্রে নিহত শ্রমিকের সংখ্যা ৫৭২

সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরের ওপর পরিচালিত জরিপে দেখা গেছে ২০১৯-এর জানুয়ারী থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত সারাদেশে ৪২৩টি কর্মক্ষেত্র দুর্ঘটনায় ৫৭২ জন শ্রমিক নিহত হয়েছে।

বেসরকারি সংস্থা সেইফটি এন্ড রাইটস সোসাইটি ২৬টি দৈনিক সংবাদপত্র (১৫টি জাতীয় এবং ১১টি স্থানীয়) মনিটরিং করে বছর শেষে রির্পোটে এ তথ্য প্রকাশ করেছে। যেসকল শ্রমিক কর্মক্ষেত্রের বাহিরে অথবা কর্মক্ষেত্র থেকে আসা-যাওয়ার পথে সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যায় তাদেরকে সংবাদপত্র জরিপে অর্ন্তভুক্ত করা হয়নি।

সংবাদপত্রের কর্মক্ষেত্র দুর্ঘটনার তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে সবচেয়ে বেশি শ্রমিক নিহত হয়েছে পরিবহন খাতে। যাদের সংখ্যা মোট ২১২ জন। এর পরেই রয়েছে নির্মাণ খাত। এই খাতে নিহত হয়েছে ১২৯ জন।

মৃত্যুর কারণ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে সড়ক দুর্ঘটনায় ২১৮ জন, বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ৬৭ জন; আগুনে পুড়ে ৬৭ জন; ছাদ, মাঁচা বা ওপর থেকে পড়ে মারা গেছে ৫৪ জন; শক্ত বা ভারী কোন বস্তুর দ্বারা আঘাত বা তার নিচে চাপা পড়ে ৪৫ জন; ব্রিজ, ভবন, ছাদ, মাটি ও দেয়াল ধসে ২৮ জন; রাসায়নিক দ্রব্য বা সেপটিক ট্যাঙ্ক বা পানির ট্যাঙ্কের বিষাক্ত গ্যাসে আক্রান্ত হয়ে ২৫ জন; বজ্রপাতে ২৫জন; পানিতে ডুবে ২০ জন; বিভিন্ন বিস্ফোরণে ১৭ জন এবং অন্যান্য কারণে ৬ জন শ্রমিক নিহত হয়েছে।

জরিপের পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, অধিকাংশ বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়ার ঘটনা ঘটে নিরাপত্তা সামগ্রী ব্যবহার না করে বৈদ্যুতিক লাইন সংযোগ দেয়ার সময়, মটর চালু করতে গিয়ে, মাথার ওপরে বয়ে যাওয়া বিদ্যুতের লাইনের নিচে কাজ করতে গিয়ে বা নির্মাণ সাইটে লোহার রড নিয়ে কাজ করার সময় শক্তিশালী বিদ্যুতের লাইন লোহার রড স্পর্শ করার ফলে।

রির্পোটে বলা হয়, নিয়মানুযায়ী যথাযথভাবে মাচা তৈরী না করার ফলে মাচা ভেঙ্গে বা মাচা থেকে পড়ে প্রায়ই নির্মাণ শ্রমিক নিহত হচ্ছে। এছাড়া, অগ্নি নির্বাপন যন্ত্রপাতির অপ্রতুলতা বা যথাযথ অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রপাতি না থাকা বা নিয়মিত মহড়া না দেয়া বা বিকল্প বহির্গমনের ব্যবস্থা না থাকার ফলে অগ্নিকান্ডে শ্রমিক মারা যায়।

একই সঙ্গে বাংলাদেশের অর্থনীতিকে সুদৃঢ় ভিত্তি দিয়েছেন। বলা যায়, বিগত বছরগুলোর মতোই ২০১৯-এও প্রবাসী শ্রমিকদের প্রেরিত অর্থই বাংলাদেশের অর্থনীতির সবচেয়ে বড় ভরসার জায়গা হয়েছিল। বছরে প্রায় ১৫ শত কোটি ডলারের রেমিট্যান্স আসে বাংলাদেশে। সরকার সর্বশেষ বাজেটে প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থে শতকরা ২ শতাংশ হারে প্রণোদনা দেয়ার ঘোষণা দিয়েছে। অর্থাৎ প্রবাসীদের পাঠানো প্রতি ১০০ টাকায় ২ টাকা বাড়তি যোগ হবে। সরকারের এই ঘোষণা বৈধ পথে প্রবাসীদের অর্থ প্রেরণে উৎসাহ যুগিয়েছে। কিন্তু প্রবাসী শ্রমিকদের মধ্যে মধ্যপ্রাচ্যে যাওয়া নারীদের দুর্দশা ও লাঞ্ছনার ধারাবাহিক ঘটনাবলী দেখা গেছে বিগত বছর। জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে এটা মাঝে মাঝেই বড় খবর হয়েছে। পাশাপাশি নৌকায় করে কাজের খোঁজে বাংলাদেশী তরুণদের সাগর পাড়ি দেয়ার মরিয়া চেষ্টাও বারবার আন্তর্জাতিক প্রচারমাধ্যমে এসেছে। এই উভয় বিষয়ে বর্তমান সংকলনে আলোকপাত করা হয়েছে। কিন্তু পরিস্থিতির কোন প্রতিকার উদ্যোগ দেখা যায়নি।

বাংলাদেশের দুর্দশাগ্রস্ত শ্রমিকদের জন্য বহুল আলোচিত শ্রমিক কল্যাণ তহবিলও যে প্রত্যাশিত কোন স্বস্তি হয়ে উঠতে পারছে না– সে বিষয়ে এ বছরের শ্রমচিত্রে বিশেষভাবে আলোকপাত করা হলো। এই তহবিলে ইতোমধ্যে জমা পড়েছে তিনশত কোটির চেয়েও বেশি অর্থ এবং এর ব্যাপকভিত্তিক ব্যাবহার যে জরুরি সেটাই আমরা দেখতে পাবো সংকলিত প্রতিবেদনটিতে। একইভাবে শ্রম আদালতগুলোও প্রক্রিয়াগত সংস্কার সাধনের মাধ্যমে আরো বেশি শ্রমিকবান্ধব হয়ে উঠতে পারে সে বিষয়েও পৃথক আরেক প্রতিবেদনে আলোকপাত করা হয়েছে। ২০১৯-এর শ্রম আদালতের সংখ্যা বেড়েছে তিনটি। এটা একটা ইতিবাচক ঘটনা ছিল।

তবে বিগত বছরে সর্বজনীন পেনশনের মতো পূর্ব প্রতিশ্রুত বিষয়ে কোন সুরাহা ঘটেনি। যদিও সবাই আশা করেছিল, বাজেটে এই বিষয়ে সুনির্দিষ্ট ঘোষণা থাকবে। পোশাক শিল্পের শ্রমিকদের রেশনের বিষয়েও মালিক ও সরকারের তরফ থেকে এই বছর কোন ঘোষণা আসেনি। ফলে দ্রব্যমূল্যের তীব্রতায় এ বছর শেষের দিকে শ্রমিক পরিবারগুলোকে চরম সংকটে পড়তে হয়েছে। বিশেষ করে, বছরের শেষার্ধে পেয়াজ, চাল, সব্জি ইত্যাদি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম ব্যাপকভাবে বেড়ে যায়। কোন কোন পণ্যের দাম প্রায় ৫০০ শতাংশ পর্যন্ত বেড়ে যায়। বাজার ব্যবস্থা কার্যত অনেকাংশেই ভেঙ্গে পড়ে। এতে শ্রমিকদের প্রকৃত আয় কমে যায়।

আয় ও প্রকৃত আয়ের মাঝে এভাবে ব্যবধান বাড়ার মাঝেই দেশের প্রধান শিল্প খাতে এ বছর ছাঁটাইয়ের ঘটনা বেড়েছে ব্যাপকভাবে। ২০১৯-এ শিল্পখাতে এটাই সবচেয়ে বড়

প্রবাসী শ্রমিকরা লাশ হয়ে ফিরছে ক্রমাগত বেশী হারে

নেতিবাচক ঘটনা ছিল। বিভিন্ন সূত্রের দাবি মতে, প্রায় ২৯ হাজার শ্রমিক ছাঁটাই হয়েছে কেবল পোশাক খাতে। এ বছর একই খাতে প্রায় ৬০টি কারখানা বন্ধ হয়েছে বলেও খবর বের হয়েছে। এ বিষয়ে বিজিএমইএ'র ভাষ্য হলো, যেসব কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে, তারা অনেকেই কমপ্লায়েন্ট নয়। নতুন করে কমপ্লায়েন্ট করতে গিয়ে তারা হিমশিম খাচ্ছে। আবার ক্রেতারাও কিছু কিছু ক্ষেত্রে অর্ডার কমিয়ে দিয়েছে। বর্তমান সংকলনে পোশাক খাতের উপরোক্ত পরিস্থিতির স্মারক হিসেবে একটা সাক্ষাৎকার রয়েছে। পাশাপাশি এই খাতে যৌন হয়রানির বিরুদ্ধে যে আন্দোলন (মি-টু) শুরু হয়েছে সেই বিষয়েও একটা প্রতিবেদন রয়েছে।

কর্মসংস্থান প্রশ্ন ও পোশাক খাত ছাড়াও এবারের এই বাৎসরিক শ্রমচিত্রে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে নির্মাণ খাতের কর্মী ও রিকসা চালকদের সমস্যাগুলোর উপর। বাংলাদেশের উদীয়মান একটা খাত হয়েও নির্মাণ শিল্পে শ্রমিক বঞ্চনা বিপুল। এছাড়া রিকসা চালকরাও নগরজীবনের এক স্থায়ী নিম্নবর্গ হয়ে আছে। নতুন পরিবহন আইন এবং তাকে ঘিরে পরিবহন শ্রমিকদের ধারাবাহিক আন্দোলন ও আপত্তির পূর্বাপর আলোকপাত করা হয়েছে অপর একটি প্রতিবেদনে।

এছাড়া দেশের গুরুত্বপূর্ণ শ্রমখাত হিসেবে রাইসমিল, চা, জাহাজভাঙ্গা শিল্পের শ্রম পরিস্থিতির পাশাপাশি ২০১৯-এর বিশেষ ঘটনা হিসেবে খুলনার খালিশপুরের পাটকল শ্রমিকদের আন্দোলনের একটা সরেজমিন প্রতিবেদন সংযুক্ত হলো এবারে। বছর শেষেও এই আন্দোলন চলছিল।

উল্লেখ্য, আগামী বছর 'শ্রমচিত্র'-এ গ্রামীণ শ্রমজীবীদের বিষয়ে মাঠ পর্যায়ের কিছু প্রতিবেদন যুক্ত করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। তারই সূচনা হিসেবে এবার একটি প্রতিবেদনে তুলে ধরা হয়েছে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে শ্রমখাতে কীরূপ পরিবর্তন ঘটছে তার একটা সংক্ষিপ্ত চিত্র।

পোশাক খাত

প্রবৃদ্ধি ও চাকুরিচ্যুতি উভয়ই বাড়ছে

রপ্তানি আয়ের ৮৪ শতাংশই তৈরি পোশাক খাত থেকে কিন্তু শ্রমিকরা অসন্তুষ্ট

দেশের পোশাক শিল্পে ২০১৯ সালে এক বিপরীতমুখী দৃশ্য বজায় ছিল। একদিকে খাতের প্রবৃদ্ধি বাড়ছিল, অন্যদিকে শ্রমিকদের চাকুরিচ্যুতি এবং অধিকার সংকোচন অব্যাহত ছিল। বছরের শুরু থেকে শ্রমিকদের মাঝে মজুরি অসন্তুষ্টি থাকলেও পুরো বছরে তার কোন সুরাহা হয়নি। এছাড়া বছর জুড়েই চাকুরিচ্যুতি নিয়ে বিভিন্ন শ্রমিক এলাকায় বিক্ষোভ ও সমাবেশ অব্যাহত ছিল। এবছর এ খাতের বড় এক প্রবণতা ছিল ছোট ছোট কারখানাগুলোর বন্ধ হয়ে যাওয়া। আবার বড় বড় কারাখানাগুলোর আয়তন ও উৎপাদনও বাড়ছিল। ২২ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত ডেইলি স্টারের এক প্রতিবেদন থেকে দেখা যায়, বছরের প্রথম সাত মাসে দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রায় ৪০টি কারখানা বন্ধ হয়েছে এবং প্রায় ২৫ হাজার শ্রমিক চাকুরি হারিয়েছে। সামগ্রিক পরিস্থিতিতে লক্ষ্য করা যায়, কারখানা পরিচালনার নিরাপত্তা শর্তাদি মেনে ছোট কারখানাগুলো আর টিকে থাকতে পারছে না। পোশাক কারখানার মালিকদের সংগঠন বিজিইএমএ-এর সূত্রে পাওয়া তথ্য থেকে দেখা যায়, ২০১২-১৩ সালে দেশে পোশাক কারখানা ছিল ৫ হাজার ৮৭৬টি। আর ২০১৮ সালে সেটা দাঁড়িয়েছে ৪ হাজার ৬২১টি। অথচ এই খাত থেকে বৈদেশিক মুদ্রার আয় কমছে না। সর্বশেষ বছরে এই খাত থেকে আয় দাঁড়িয়েছে ৩৪ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাংলাদেশের রপ্তানি আয় ছিল ৪৬ দশমিক ৮৭ বিলিয়ন ডলার। এর মধ্যে পণ্য রপ্তানিতে আয় হয়েছে ৪০ দশমিক ৫৩ বিলিয়ন ডলার, যা লক্ষ্যমাত্রার ৩ দশমিক ৯৪ শতাংশ বেশি। আর সেবা রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ২৬ দশমিক ৭৭ শতাংশ বেড়ে ৬ দশমিক ৩৩ বিলিয়ন ডলার আয় হয়েছে। ২০০৮ সাল থেকে ২০১৮ সালে এই রপ্তানি বৃদ্ধির পরিমাণ প্রায় ৩০ গুণ। সব মিলে ২০১৮ সালে লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে প্রায় চার শতাংশ বেশি রপ্তানি আয় করেছে বাংলাদেশ। এই বিপুল রপ্তানি আয়ের ৮৪ শতাংশই এসেছে গার্মেন্টস খাত থেকে। বাকি ১৬ শতাংশ এসেছে অন্যান্য

সব খাত থেকে। এতে করে বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের প্রায় পুরোটাই তৈরি পোশাক খাত নির্ভর হয়ে পড়েছে। এই বাস্তবতা মেনেই আসন্ন বছরগুলোতে সরকার এই খাতের রপ্তানি আয় ৫০ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করার চেষ্টা করছে।

অথচ এই পরিস্থিতির ঠিক বিপরীত চিত্র হিসেবে মাঠ পর্যায়ে একদিকে পোশাক কারখানা বন্ধ হচ্ছে এবং অন্যদিকে শ্রমিকদের মজুরি ও কর্মপরিবেশ নিয়ে অসন্তোষ চলছে। সর্বশেষ নিম্নতম মজুরি কাঠামোতে একজন শ্রমিকের আয়ে ৪ সদস্যের একটি পরিবারের পক্ষে দারিদ্র্য মানদন্ডের উপরে উঠে বসবাস কোনভাবেই সম্ভব নয় বলে বিভিন্ন গবেষক বার বার বলছেন।

অন্যদিকে বিপুল শ্রমিককে দেখিয়ে তৈরি পোশাক শিল্পের মালিকরা রপ্তানিতে উৎস কর ১ শতাংশ থেকে কমিয়ে প্রথমে দশমিক ৬ শতাংশ নির্ধারণ করান এবং পরে তা আরও কমিয়ে করা হয় দশমিক ২৫ শতাংশ। কমানো হয় এ খাতের করপোরেট করও। কিন্তু এসব পদক্ষেপের কোন হিস্যা শ্রমিকদের মাঝে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বন্টিত হয়নি। এমনকি ঈদের আগে কর্মকাল এক বছর পূর্ণ হয়নি বলে বোনাসও দেওয়া হয়নি প্রায় ছয় লাখ শ্রমিককে।

এদিকে ২০১৮ সালের শেষে নতুন মজুরি কাঠামো নিয়ে অসন্তোষের জেরে ঢাকা, আশুলিয়া, নারায়ণগঞ্জ, সাভার ও গাজীপুরে শ্রমিকরা যে বিক্ষোভ করে তার কারণে প্রায় সাড়ে সাত হাজার শ্রমিককে চাকুরি থেকে ছাঁটাই করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছে শ্রমিক সংগঠনগুলো। পুলিশের বরাত দিয়ে বার্তা সংস্থা এএফপি জানিয়েছিল, কারখানা পর্যায়ে ৪ হাজার ৮৯৯ জনকে চাকরিচ্যুত করা হয়। তবে শ্রমিক নেতারা বলছে, অন্য কোনো কারখানায় যাতে চাকরি না পায় সেজন্য আরও ১ হাজার ৭০০ শ্রমিককে কালো তালিকাভুক্ত করা হয় তখন। ভাঙচুরের অভিযোগে শ্রমিকদের চাকরিচ্যুত করা হলেও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন হিউম্যান রাইটস ওয়াচ বলছে, কারখানাগুলো তাদের নোটিশে সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্য প্রমাণ দেয়নি। জানুয়ারির বিক্ষোভের ঘটনায় ৫৫১ শ্রমিকের নামে ও কমপক্ষে তিন হাজার অজ্ঞাতনামার বিরুদ্ধে ২৯টি মামলা হয়েছে। এদিকে একই বিষয়ে ২০১৯-এর ২৩ আগস্ট বার্তা সংস্থা 'জাগো নিউজে'র এক প্রতিবেদনে দেখা যায়, বছরের শুরুর মজুরির আন্দোলনে সর্বশেষ ৭ হাজার ৪৫৮ জন পোশাক শ্রমিকের নামে মামলা হয়েছে। আর ১০৪টি কারখানায় চাকরিচ্যুত করা হয় ১২ হাজার ৪৩৬ জন শ্রমিককে। গ্রেফতার হওয়া ৭৫ জন শ্রমিক জামিন পেলেও প্রতিনিয়ত হয়রানির শিকার হচ্ছেন তাঁরা। এর বাইরে আন্দোলনকালে নিহত শ্রমিকের পরিবারও তখন পর্যন্ত উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ পায়নি।

কয়েকটি খাতে নিম্নতম মজুরির খসড়া প্রস্তাব

২০১৯-এ দেশের কয়েকটি খাতে নিম্নতম মজুরি প্রস্তাব প্রকাশ করেছে নিম্নতম মজুরি বোর্ড। এর মধ্যে চামড়া পণ্য ও জুতা কারখানা শিল্পের শ্রমিকদের মাসিক সর্বনিম্ন মজুরি প্রস্তাব করা হয়েছে ৭,১০০ টাকা। ১১ ডিসেম্বর এটা প্রজ্ঞাপন আকারে প্রকাশ করা হয়।

সড়ক পরিবহন খাতে হেলপারদের জন্য মাসিক সর্বনিম্ন মজুরি প্রস্তাব করা হয়েছে ১০,১০০–১০,৭৫০। আর সর্বোচ্চ স্তরে ভারী গাড়ির চালকদের জন্য মজুরি প্রস্তাব রয়েছে ১৬,৬৮০-২০,২০০ টাকা। বিভাগীয় শহরগুলোর ক্ষেত্রে মজুরি হার সাধারণ এলাকার চেয়ে কিছুটা ভিন্ন রাখা হয়। ইস্পাত ও রি-রোলিং মিল ও প্লাস্টিক খাতে সর্বনিম্ন মজুরি প্রস্তাব করা হয় যথাক্রমে ১১,৫৫০ ও ৮,০০০ টাকা। এছাড়া প্লাস্টিক খাতে শিক্ষানবিসদের মজুরি প্রস্তাব করা হয় ৬,৫০০ টাকা।

এর মাঝে সড়ক ও ইস্পাত খাতের মজুরি কাঠামোর প্রস্তাব ঘোষিত হয় ১২ ডিসেম্বর এবং প্লাস্টিক খাতের মজুরি কাঠামোর প্রস্তাব করা হয় ১১ ডিসেম্বর। ঘোষণার ১৪ দিন পর লিখিত আপত্তিগুলোর মীমাংসা শেষে উপরোক্ত মজুরি কাঠামোসমূহ চূড়ান্ত করা হতে পারে। এসব ঘোষণার সময় একই খাতসমূহের কর্মচারিদের জন্যও মজুরি সুপারিশ প্রকাশ করা হয়।

চামড়া শিল্পে মজুরি কাঠামোতে শ্রমিকদের জন্য ছয়টি গ্রেড রাখা হয়। এছাড়া শিক্ষানবিস শ্রমিকের মাসিক মজুরি ৫,৫০০ টাকা সুপারিশ করা হয়েছে সেখানে।

সড়ক খাতে মোট ৫টি ধাপ রয়েছে মজুরি কাঠামোতে। ইস্পাত খাতেও রয়েছে ৫টি গ্রেড। প্লাস্টিক খাতে রয়েছে ৪টি গ্রেড ও শিক্ষানবিস স্তর। সড়ক পরিবহন খাতের মজুরি কাঠামো ব্যক্তিমালিকানাধীন সড়ক পরিবহন শ্রমিকদের জন্য প্রযোজ্য হবে।

খসড়া মজুরি কাঠামোতে চামড়াশিল্পে কর্মচারিদের থাকছে চারটি গ্রেড। তাতে সর্বনিম্ন মজুরি রয়েছে ৮,৫২৫ টাকা। সড়ক খাতে কর্মচারিদের সর্বনিম্ন মজুরি ৮০০০ টাকা, প্লাস্টিক খাতেও কর্মচারিদের সর্বনিম্ন মজুরি ৮,০০০ টাকা প্রস্তাব করা হয়। রি রোলিং খাতে কর্মচারিদের সর্বনিম্ন মজুরি প্রস্তাব করা হয় ১২,৩০০ টাকা।

সকল ক্ষেত্রেই মালিকরা চাইলে অধিক মজুরি দিতে পারবেন।

পোশাক খাত

শ্রমিকদের যৌন নিপীড়ন বিরোধী আন্দোলন

সংখ্যাগরিষ্ঠ নারী শ্রমিকই চাকুরিটি টিকিয়ে রাখার স্বার্থে এ বিষয়ে মুখ খোলেন না। বাংলাদেশের গার্মেন্টস খাতের নারীশ্রমিকদের সংখ্যাগরিষ্ঠই কর্মজীবনের কোন না কোন পর্যায়ে কোন না কোনভাবে যৌন হয়রানির শিকার হচ্ছেন।

২০১৯- এ বছর গার্মেন্ট খাতে যদিও গতানুগতিক বিবেচনায় বড় ধরনের আন্দোলন-সংগ্রাম হয়নি কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়ে নারী শ্রমিকরা পুরানো প্রথা ভেঙ্গে সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন। সেটা হলো কারখানা পর্যায়ে এবং কারখানার বাইরে তাদের বিরুদ্ধে যে যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন হচ্ছে তার বিরুদ্ধে কথা বলা। ফলে এ সংক্রান্ত দীর্ঘ নীরবতার অবসান শুরু হয়েছে। অনেকেই এটাকে বলছিলেন পোশাক খাতের 'মি-টু' আন্দোলন। সুদূর ইংল্যান্ডের দৈনিকসমূহেও ২০১৯- এ বাংলাদেশের শ্রমিকদের 'মি-টু আন্দোলন' বিষয়ে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। যেখানে দেখা যায়, ডলি আক্তার নামের একজন নারীশ্রমিক তার লাইন ম্যানেজার কর্তৃক যৌন নিগ্রহের বিবরণ দিয়ে বিচারহীনতার সর্বব্যাপক সংস্কৃতির অবসান চাইছেন। ডলি আক্তারের জবানিতে জানা যায়, মজুরি বিক্রির জীবনে প্রায় অধিকাংশ কারখানাতে এই সমস্যা মোকাবেলা করতে হয়েছে তাঁকে এবং শেষপর্যন্ত তাঁর চাকুরি করা ও পাওয়াই দুঃসাধ্য করে তোলা হয়। তাঁর এই বিবরণ থেকে অন্যান্য শ্রমিকদের অবস্থাও কিছুটা আঁচ করা যায়– যদিও সংখ্যাগরিষ্ঠ নারী শ্রমিকই চাকুরিটি টিকিয়ে রাখার স্বার্থে এ বিষয়ে মুখ খোলেন না। ব্রিটেনের দ্য গার্ডিয়ান ২০১৯-এর ১০ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত তাদের প্রতিবেদনে বলেছে, বাংলাদেশের গার্মেন্টস খাতের নারীশ্রমিকদের সংখ্যাগরিষ্ঠই কর্মজীবনের কোন না কোন পর্যায়ে কোন না কোনভাবে যৌন হয়রানির শিকার হয়। এ বিষয়ে তারা 'একশন এইড' নামক সংস্থার এ সংক্রান্ত গবেষণা উপাত্ত তুলে ধরে। গার্ডিয়ানের এই প্রতিবেদনে ডলি আক্তার ছাড়া আরও অনেক নারী শ্রমিক জানিয়েছেন কীভাবে চাকুরি রক্ষা করতে যেয়ে তাদের যৌন নিগ্রহ মেনে নিতে হয়েছে।

একই বিষয়ে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ গত বছর (২০১৯) যে গবেষণাপত্র প্রকাশ করেছে তাতে দেখা যায়, পোশাক খাতে কারখানা পর্যায়ে নারীদের লাঞ্ছনা শুরু হয় গালাগাল থেকে। উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কাজ না হলেই এই গালাগাল খেতে হয় অনেক সময়। এর বাইরে আছে, কোন প্রয়োজন ছাড়াই হঠাৎ হঠাৎ গা ঘেঁষে দাঁড়ানো, অনাকাঙ্খিতভাবে শরীর স্পর্শ করা, চুমু খাওয়ার চেষ্টা করা, যৌন কাজের প্রস্তাব দেয়া ইত্যাদি। সুপারভাইজার থেকে শুরু করে প্রডাকশান ম্যানেজার পর্যন্ত অনেকেই এসব করেন। কমপ্লায়েন্স কারখানাগুলোতে এসব কম; ছোট ছোট কারখানাগুলোতে সেটা বেশি। চাকুরি নিয়ে নেয়ার ভয় দেখিয়ে নারী কর্মীকে ব্ল্যাকমেইল করার চেষ্টার বহু অভিযোগ রয়েছে ভুক্তভোগীদের তরফ থেকে। যত নীচু পদের কর্মী, লাঞ্ছনার শঙ্কাও থাকে তত বেশি। 'প্রস্তাব'-এ সাড়া না দিলেই কাজের মান ও পরিমাণ নিয়ে অসন্তোষ তৈরি হতে থাকে। অন্যদিকে, কারখানার বাইরে আসা-যাওয়ার পথে এবং থাকার জায়গাগুলোতেও পোশাক খাতের নারী কর্মীরা যৌন হয়রানি এবং অত্যাচারের শিকার হন। সংবাদপত্রে ধর্ষনের মতো ঘটনার প্রতিবেদন যদিও কমই উঠে আসে– কিন্তু তারপরও বছরে তার সংখ্যা ১০-১৫টির কম নয়। উপরোক্ত গবেষণাকালে ২০১৬ সালে এক বছরে এইরূপ ১৬টি উদাহরণ পাওয়া গেছে। এছাড়া কর্মস্থলে আসা-যাওয়ার পথে যানবাহনে নারী কর্মীদের হয়রানির অভিজ্ঞতা প্রায় সকলেরই। এটা কেবল পরিবহন শ্রমিকদের দ্বারাই নয়– যাত্রীদের কারো কারো দ্বারাও ঘটে।

অনেক নারী শ্রমিক বিয়ের ক্ষেত্রেও প্রতারণার শিকার হন। অনেক পুরুষ শ্রমিক তাদের পূর্বতন বিয়ের তথ্য গোপন করে শিল্পাঞ্চলে এসে অনেক নারী কর্মীর সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলেন

এবং পুনরায় বিয়ে করেন। এক পর্যায়ে এইরূপ স্বামীরা লাপাত্তা হয়ে যান বা দাম্পত্য জীবন ছেড়ে চলে যান। এরকম অভিযোগ বিপুল।

কয়েকটি এনজিও'র তৈরি একটি প্লাটফর্ম 'সজাগ কেয়ালিশন' গেল বছর একটি গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করেছিলো। চারটি এলাকার আটটি কারখানার শ্রমিকের ওপর করা ওই গবেষণায় দেখা গেছে, ২২ শতাংশ শ্রমিক জানিয়েছেন, তারা কখনো-না-কখনো যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন। কমবেশী ৮৩ শতাংশ শ্রমিক কর্মক্ষেত্রে নিরাপদ বোধ করেন না বলে জানিয়েছেন। যৌন হয়রানি হিসেবে কারখানায় প্রবেশের সময় নিরাপত্তা কর্মীদের অস্বস্তিকরভাবে দেহ তল্লাশি, পুরুষ সহকর্মীর অপ্রত্যাশিত স্পর্শ, মাঝারি পর্যায়ের কর্মকর্তাদের দ্বারা যৌন সম্পর্ক তৈরির চেষ্টা, সম্পর্ক তৈরি না করলে ভয়ভীতি প্রদর্শন– এগুলো উল্লেখ করা হয়েছে ওই প্রতিবেদনে। শ্রমিকদের ৬৮ শতাংশ জানান, কর্মক্ষেত্রে তেমন কার্যকর কোন যৌন হয়রানি প্রতিরোধ কমিটি নেই।

অন্যদিকে, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ) ও 'কর্মজীবী নারী' নামের দু'টি বেসরকারি সংস্থা ২০১৯-এর ৭ মে এক সংবাদ সম্মেলনে তাদের এক অনুসন্ধানের ফল তুলে ধরে জানিয়েছে, তৈরি পোশাক কারখানায় কর্মরত নারী শ্রমিকদের মধ্যে শতকরা ২২ দশমিক ৪ ভাগ কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানির শিকার হচ্ছে। এছাড়াও শতকরা ৩৫ দশমিক ৩ ভাগ নারী কর্মী বলেছেন, তারা কর্মক্ষেত্রে নারী শ্রমিকের প্রতি যৌন হয়রানির ঘটনা দেখেছেন বা শুনেছেন। গবেষণা প্রতিবেদনে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, কর্মক্ষেত্রে নারী শ্রমিকরা যে ধরনের যৌন হয়রানির শিকার হয়, এরমধ্যে সবচেয়ে বেশি, অর্থাৎ ৪২ দশমিক ৩৩ শতাংশ হচ্ছে 'কামনার দৃষ্টিতে তাকানো'। এরপর আছে 'সংবেদনশীল অঙ্গে কোনোকিছু নিক্ষেপ করা'; যা শতকরা ৩৪ দশমিক ৯২ এবং সংবেদনশীল অঙ্গের প্রতি লোলুপ দৃষ্টিতে তাকানো'– যা শতকরা ৩৩ দশমিক ৮৫ ভাগ। কাজ বোঝানোর বা কথা বলার সময় শরীর স্পর্শ করার কথা বলেছেন শতকরা ২৮ দশমিক ৫৭ নারী শ্রমিক। এছাড়াও আছে অশোভন অঙ্গভঙ্গি, বাজে গালি দেওয়া, চাকরিচ্যুতির হুমকি এবং পদোন্নতির লোভ দেখিয়ে যৌন সম্পর্কের প্রস্তাব ইত্যাদি।

নারী শ্রমিকদের জন্য সবচেয়ে কঠিন অবস্থা হলো, হয়রানি বা প্রতারণা যে ধরনেরই সমস্যা হোক– তাদের অভিযোগ জানানো বা প্রতিকার পাওয়ার নারীবান্ধব কোন সহজ ও সুবিধাজনক কাঠামো নেই। বরং থানা থেকে শুরু করে কারখানা পর্যায়ে এইরূপ অভিযোগ জানানো মাত্রই তার জীবন আরও দূর্বিষহ হয়ে ওঠে। এমনকি শ্রমিক সংগঠনগুলোতেও নারী শ্রমিকদের শারীরিক নিগ্রহের বিষয়গুলোকে তুলনামূলকভাবে কম

গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে করা হয়। সংবাদ সংস্থা বিবিসির সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে ২০১৯-এ পোশাক খাতের ট্রেড ইউনিয়নগুলোর একটি প্লাটফর্ম, গার্মেন্টস শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের কার্যকরী সভাপতি কাজী রুহুল আমিন জানান, 'আমাদের কাছে বিভিন্ন সময় নারী শ্রমিক বোনেরা আসেন। কারখানায় নানাভাবে এটা ঘটে। ম্যানেজমেন্ট থেকে যেমন ঘটে তেমনি পুরুষ শ্রমিকদের দ্বারাও ঘটে।' তিনটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'আমরা ব্যাপারটা বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, ব্লাস্ট, আইন ও সালিশ কেন্দ্র– এদের কাছে সাধারণত রেফার করি।'

বাংলাদেশ শ্রম অধিকার ফোরাম ও নাগরিক উদ্যোগ নামের দুটি সংস্থাও ২০১৯-এ কর্মস্থলে নারী শ্রমিকদের নিরাপত্তা বিষয়ে অনুরূপ গবেষণা শেষে জানায় যে, কর্মক্ষেত্রে ৯০ শতাংশ নারী শ্রমিক মানসিক নির্যাতন, ৫১ শতাংশ শারীরিক নির্যাতন এবং ৪৩ শতাংশ যৌন হয়রানির শিকার হন। 'কর্মক্ষেত্রে নারীর প্রতি নির্যাতন ও হয়রানি : প্রেক্ষিত বাংলাদেশের পোশাকশিল্প' শীর্ষক এক গবেষণা প্রতিবেদনে সংগঠন দুটো উপরোক্ত তথ্য তুলে ধরে। ঢাকার মোহাম্মদপুর, মিরপুর, আশুলিয়া, টঙ্গী, তুরাগ, ধামরাই, উত্তরা, মালিবাগ, খিলগাঁও, রামপুরা, যাত্রাবাড়ী, সায়েদাবাদ ও নারায়ণগঞ্জ এলাকার পোশাক শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলে প্রতিবেদনের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছিল।

পোশাক খাত: সাক্ষাৎকার

‘বঞ্চনার প্রতিকার না পেয়েই কেবল শ্রমিকরা রাস্তায় নামে’

শামীম ইমাম
নির্বাহী উপদেষ্টা, গার্মেন্ট শ্রমিক মুক্তি আন্দোলন

আপনার সঙ্গে যখন কথা বলছি, তখন ২০১৯ প্রায় বিদায় নিচ্ছে। এসময় দেখছি, রাজধানীতে ও আশে-পাশে বিভিন্ন শিল্পাঞ্চলে পোশাক শ্রমিকরা বিক্ষোভ করছে। এটা কেন?

হ্যা, বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ হচ্ছে, রাস্তা অবরোধ হচ্ছে, মিছিল-সমাবেশ হচ্ছে। মূলত দুটি কারণে এগুলো হচ্ছে। একটা হলো শ্রমিকদের বকেয়া মজুরির দাবিতে। আরেকটি কারণ হলো বেআইনীভাবে শ্রমিক ছাঁটাই। অনেক দিন ধরেই পোশাক তৈরি শিল্পে এ দুটো সমস্যা তীব্র আকার ধারণ করেছে। যদিও এই খাতে এটাকে বাল্যব্যাধিও বলা যায়। মিরপুরে এডেন্স নামে একটা কারখানায় মালিক কোন এক শিপমেন্টে লোকসান দিয়েছেন দেখে এই অজুহাতেও শ্রমিকদের বেতন কাটার ঘটনা ঘটেছে। কোন আইনে এসব হচ্ছে তার কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না এবং শ্রমিকদের রাস্তায় নামা ছাড়াও উপায় থাকছে না। ফলে এরকম ঘটনা ঘটবেই।

পোশাক খাতে কী মজুরি নিয়মিত দেয়া হয় না?

শ্রম আইনে মজুরি সাত তারিখের মধ্যে দেয়ার কথা। কিন্তু অনেক কারখানায় সেটা ২০-২৫ তারিখেও দেয়া হয় না। একজন শ্রমিক তো মজুরির জন্য কাজ করে। সময় মতো মাসের বেতন না পেলে অনেক সমস্যা। বাড়িওয়ালা তাগাদা দেয়, দোকানদার তাগাদা দেয়। কারণ শ্রমিকরা সারা মাস আশেপাশের দোকান থেকে বাকিতে পণ্য নেয়। দৈনিক বণিকবার্তা এক গবেষণা প্রতিবেদন করে দেখিয়েছিল ৮৭ ভাগ শ্রমিক ধার করে চলে। এই বিষয়গুলো বুঝতে হবে আমাদের। না হলে বিক্ষোভের মূল কারণ আমরা বুঝবো না।

কিন্তু বিষয়গুলোর তো কোন সুরাহাও হচ্ছে না–

হ্যা, এসব আন্দোলন কোন যৌক্তিক জায়গায় যেতে পারছে না। ছাঁটাই করার সময় আইনের তোয়াক্কা করা হয় না। আবার নানাভাবে প্রতারণা করা হয়। কিন্তু শ্রমিকদেরও সংগঠন ও যোগ্য নেতৃত্ব নাই। ফলে সুরাহাও হয় না। মালিকরা শ্রম আইনের এমন ধারায় ছাঁটাই করছেন– যাতে শ্রমিকরা ছাঁটাইজনিত সুবিধাটুকুও না পান। ফলে মাঝে মাঝে শ্রমিকরা রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ করেন। এটা তাদের নিরূপায় অবস্থার প্রমাণ। শ্রমিকরা আর কী করতে পারে।

মালিকরা যুক্তি হিসেবে বলছেন– নানান সমস্যার কথা–

মালিকদের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে ৪০-৫০ টি কারখানা সম্প্রতি বন্ধ হয়েছে। প্রায় ২৫ হাজার শ্রমিক সেই কারণে চাকুরিচ্যুত হয়েছে। বন্ধ হচ্ছে, কারণ অর্ডার কম। আসলে কমপ্লায়েন্সের শর্ত মেনে অনেক ছোট কারখানা দাঁড়িয়ে থাকতে পারেনি। পারছেন না। এছাড়াও কারখানা বন্ধের অনেক কারণ থাকতে পারে। উৎপাদন সমস্যার অনেক কারণ থাকতে পারে। কিন্তু সব কিছুর দায় বইতে হচ্ছে কেবল শ্রমিকদের। যেন শ্রমিকদেরই অপরাধ সকল কিছু। আসলে আরও কিছু কারণেও ছাঁটাই হতে হচ্ছে শ্রমিকদের। যেমন, ৩৫-এর বেশি বয়সী শ্রমিকদের ছাঁটাই করছে মালিকরা। ভাবা হচ্ছে এদের উৎপাদনশীলতা কম। আবার অনেক শ্রমিককেই চাকুরির বয়স চার বছরের বেশি হতে দেয়া হয় না। চাকুরির বয়স বেশি হলে তাকে অনেক ধরনের বেনিফিট দিতে হবে। এই বিবেচনা থেকে আগেই তাকে বাদ দেয়া হয়। এছাড়া সবচেয়ে বড় আরেক কারণ হলো, কোন কারণে কোন শ্রমিক সংগঠিত হতে চাইলে– কোন সংগঠন করতে অগ্রসর হলে, কোন সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হলে– তাকে কেবল ছাঁটাই নয়, তার ছবিটি পারলে ওয়েবসাইটে দিয়ে দেয়া হয়। যাতে সে অন্য কারখানাতেও কাজ না পায়। যে কারণে অনেক শ্রমিক পরিচয় গোপন করে এখন কাজ নেয়। অনেক সময় ছাঁটাইয়ের পর ক্ষতিপূরণ চাইতে গেলে মারও খেতে হয়। কারণ কারখানায় কারখানায় একদল এমন মানুষ রাখা হয় যাদের কাজ প্রতিবাদী শ্রমিককে

নাজেহাল করা। অনেক শ্রমিককে ছাঁটাইয়ের সময় সাদা কাগজে স্বাক্ষর করিয়ে রাখা হয়। পরে সেখানে লিখে নেয়া হয়– সে স্বেচ্ছায় চাকুরি ছেড়ে চলে গেছে। সাদা কাগজে সই করানোর ঘটনা এখন ব্যাপকভাবে বেড়ে গেছে। মা হওয়ার লক্ষণ দেখা গেলে অনেক নারী শ্রমিক আগাম ছাঁটাই হয়ে যাচ্ছে।

শ্রমিক সংগঠনগুলো কী কিছু করতে পারছে না?

শ্রমিক সংগঠনই তো করা যাচ্ছে না। আমরা গাজিপুরে আমাদের সংগঠনের কেবল একটা অফিস খুলতে গিয়েছি। এতে আমাদের প্রধান এক সংগঠকের স্ত্রীর চাকুরি চলে গেল তার কারখানায়। আরও চার জন বিভিন্ন কারখানায় চাকুরি হারালো। ভাবেন অবস্থা। একটা কার্যালয় খোলার কারণে যদি এমন হয় তাহলে সেখানে কারখানা পর্যায়ে সংগঠন করা যায়? শ্রমিকরা ভয়ে কোন সংগঠকের সঙ্গে কথাই বলে না। আশুলিয়ার মতো বিশাল শ্রমিক এলাকায় ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের মতো বহুল পরিচিত সংগঠন নিজেদের অফিসটি খুলে বসতে পারছে না। এসব স্থানে শিল্প পুলিশ নামে যারা রয়েছেন তারা মূলত মালিকরা যা চাইছেন সে অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করছেন।

আপনাদের সংগঠনের কাজে আর কী বাধা পান?

রেজিস্ট্রেশন চেয়েছি, অনৈতিক সুবিধা চাইলো। তবে রানাপ্লাজার পর রেজিস্ট্রেশন বেড়েছে, এটাও স্বীকার করবো। কিন্তু সামগ্রিকভাবে শ্রমিক স্বার্থে কাজ করাকে দুরূহ করে ফেলা হয়েছে। আশুলিয়ায় এমনকি শ্রমিক সংগঠকের নামে দালালে সয়লাব করে ফেলা হয়েছে। কে শ্রমিক, আর কে 'সোর্স' তা বোঝাই কঠিন। সেখানে মালিকরা একদল দালাল নেতৃত্ব তৈরি করা হয়েছে। তারাই আবার অবাধে রেজিস্ট্রেশনও পাচ্ছে। প্রকৃত সংগঠকদের পক্ষে কাজ করা কঠিন। আশুলিয়া ও গাজিপুরে শ্রমিকদের অধিকারভিত্তিক কাজ প্রায় অসম্ভব করে ফেলা হয়েছে। এখন শ্রমিকরা যদি গাজিপুরে অধিকার হারায়, আর আমরা যদি ঢাকার পল্টনে মিছিল করি তাহলে তো দাবি আদায়ের কোন সুযোগ নেই। দেশে এভাবে সুস্থধারার শ্রমিক সংগঠন গড়েও উঠবে না। শ্রমিক সংগঠন করাকে এখানে ষড়যন্ত্র হিসেবে দেখা ও দেখানোর একটা পরিকল্পিত উদ্যোগ আছে। শ্রমিকদের স্বার্থে কথা বললেই এটাকে 'অস্থিতিশীলতা'র চেষ্টা হিসেবে ব্যাপক প্রচার শুরু হয়ে যায়। তার মানে শ্রমিকরা কথাই বলতে পারবে না। কিছু মিডিয়াকেও শ্রমিক সংগঠকদের চরিত্রহননে নামানো হয় যখন তখন।

২০১৯-এর শ্রমিক অঙ্গনে আর কোন বৈশিষ্ট্যকে আপনি গুরুত্বপূর্ণ মনে করছেন?

মালিকরা শ্রমবিধি আবার পাল্টাতে চাইছেন। এই বিধির যেসব

অনেক শ্রমিককে ছাঁটাইয়ের সময় সাদা কাগজে স্বাক্ষর করিয়ে রাখা হয়। পরে সেখানে লিখে নেয়া হয়– সে স্বেচ্ছায় চাকুরি ছেড়ে চলে গেছে। সাদা কাগজে সই করানোর ঘটনা এখন ব্যাপকভাবে বেড়ে গেছে।

ধারায় শ্রমিকরা কিছু সুবিধা পেত মালিকরা সেগুলোকেও এখন বাদ দিবেন বলে মনে হচ্ছে। আবার কিছু দালাল সংগঠনকে দিয়ে সেসব কাজকে ন্যায্যতা দেয়ার আয়োজনও চলছে। এতে শ্রমিকদের অধিকার আরও কমবে।

শ্রমিক স্বার্থের দিক থেকে ২০১৯-এ আশাবাদী হওয়ার মতো কিছু পাচ্ছি কী আমরা?

পাচ্ছি। শ্রমিকদের মাঝে একটা উপলব্ধি এসেছে– সংঘবদ্ধ নয় বলেই তাদের এই দুরাবস্থা। আর সংগঠনগুলোর মাঝেও এই উপলব্ধি হয়েছে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দাঁড়াতে না পারলে শ্রমিক স্বার্থে কিছু অর্জন করা যাবে না। আর আমাদের উপলব্ধি হলো– নিজেদের সাংগঠনিক দুর্বলতা কাটাতে হবে। এই উপলব্ধিগুলোই একমাত্র ভালো দিক।

শ্রমিকদের স্বার্থে কথা বললেই এটাকে 'অস্থিতিশীলতা'র চেষ্টা হিসেবে ব্যাপক প্রচার শুরু হয়ে যায়। তার মানে শ্রমিকরা কথাই বলতে পারবে না। কিছু মিডিয়াকেও শ্রমিক সংগঠকদের চরিত্রহননে নামানো হয় যখন তখন।

বাজেট ২০১৯-২০: শ্রম খাতের প্রাপ্তি

মন্ত্রণালয়ভিত্তিক বরাদ্দের তালিকায় সবচেয়ে নীচে শ্রম ও কর্মসংস্থান

শ্রম ও কর্মসংস্থানে বরাদ্দ প্রতিরক্ষার দশমিক ৯৬ শতাংশ!

২০১৯-২০ সালের বাজেটে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছিল ৩১৩ কোটি টাকা। এটা অন্যান্য সকল মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দের চেয়ে কম। এক হিসাবে দেখা গেছে, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের জন্য যে বরাদ্দ রাখা হয়েছে তা প্রতিরক্ষা খাতের বরাদ্দের (৩২৫২০ কোটি) দশমিক ৯৬ শতাংশ।

কয়েকটি মন্ত্রণালয়ের তুলনামূলক চিত্রে দেখা যায় শ্রম ও কর্মসংস্থানের বরাদ্দ মহিলা ও শিশু মন্ত্রণালয়ের জন্য যে বরাদ্দ রয়েছে (৩৭৪৯ কোটি টাকা) তার আট শতাংশ। মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দের ১১ ভাগ। শ্রম ও কর্মসংস্থানের জন্য বরাদ্দ এমনকি তথ্য, সংস্কৃতি, ধর্ম, ক্রীড়া ইত্যাদি মন্ত্রণালয়ের চেয়েও বহু কম। এরূপ চিত্র নিঃসন্দেহে বাংলাদেশে শ্রমজীবীদের জন্য রাষ্ট্রের অগ্রাধিকারের এক করুণ অবস্থা নির্দেশ করে। পূর্ববর্তী অর্থবছরেও সকল মন্ত্রণালয়ের চেয়ে শ্রম ও কর্মসংস্থান সবচেয়ে কম বরাদ্দ পেয়েছিল।

শ্রম ও কর্মসংস্থান সংশ্লিষ্ট অপর মন্ত্রণালয় প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়েও বরাদ্দ গত বছরের চেয়ে কমে গেছে। ২০১৮-১৯-এর সংশোধিত বাজেটে এ মন্ত্রণালয় পেয়েছিল ৫৯৬ কোটি টাকা। পরবর্তী বছর পেয়েছে ৫৯১ টাকা। মুদ্রাস্ফীতিকে বিবেচনায় নিলে বরাদ্দের এই নিম্নমুখীতা নিশ্চিতভাবেই আরও বাড়ে। অথচ বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম ভিত্তি বলা হয় প্রবাসীদের পাঠানো আয়কে।

আরো লক্ষ্যণীয় যে, ২০০৫-০৬ অর্থবছরে বাংলাদেশের বাজেটের আকার ছিল ৬৪ হাজার কোটি টাকা; আর ২০১৯-২০ অর্থবছরের বাজেট প্রস্তাবের আকার ধরা হয়েছে ৫ লাখ ২৩ হাজার কোটি টাকা, যা ২০০৫-০৬ এর তুলনায় আট গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু সে অনুযায়ী শ্রমজীবীদের স্বার্থে উন্নয়ন বরাদ্দ বাড়ছে না। যার সাক্ষ্য হয়ে আছে অন্তত সংশ্লিষ্ট দুটি মন্ত্রণালয়। আগামী অর্থ বছর কী এ অবস্থা বদলাবে?

শ্রমখাতে গত তিন বছরের বাজেট বরাদ্দ চিত্রের পর্যালোচনা

বাংলাদেশে বিগত বছরগুলোতে ধারাবাহিকভাবেই বাজেটের আয়তন বেড়েছে। প্রায় অধিকাংশ মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ বেড়েছে। কিন্তু লক্ষ্যণীয়ভাবে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ বেড়েছে সামান্য। অথচ জাতীয় আয়ে শ্রমিকদের হিস্যা বিপুল। গত তিন বছরের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যাচ্ছে, এই মন্ত্রণালয়ের জন্য বরাদ্দ থাকছে গড়ে ২৬৯ কোটি টাকা। এই বরাদ্দেরও অর্ধেকই পরিচালন ব্যয়। ফলে উন্নয়ন ব্যয় থাকছে সামান্যই। আবার উন্নয়ন ব্যয়ের ক্ষেত্রেও গুরুত্ব পাচ্ছে কেবল পোশাকখাত। অন্যান্য আনুষ্ঠানিক খাত প্রয়োজনীয় নজর পাচ্ছে না। আরও লক্ষ্যণীয়, শহরাঞ্চলের বিভিন্ন শিল্প খাতের শ্রমিকদের দৈনন্দিন জীবনের চাহিদা যেমন স্বাস্থ্য, কম খরচে আবাসিক সুবিধা, শিল্প এলাকায় শিশু যত্নকেন্দ্র স্থাপন, রেশন সুবিধা ইত্যাদি বিষয়গুলোর সাথে শ্রম মন্ত্রণালয়ের বড় বড় প্রকল্পগুলোর সামান্যই সম্পর্ক রয়েছে। অথচ বিগত কয়েক বছর ধরে শ্রমজীবী মানুষ ও শ্রমিক আন্দোলনগুলোর সামনে মজুরি বাড়ানোর পাশাপাশি এগুলো ছিল মূল দাবি। বাজেটে এসব দাবি কার্যত উপেক্ষিতই থাকছে।

শ্রম মন্ত্রণালয়ের জন্য বাজেট বরাদ্দ চিত্র (২০১৭-২০১৯)

বছর	বরাদ্দ (কোটি)
২০১৭-১৮	২৬৮
২০১৮-১৯	২২৭
২০১৯-২০	৩১৩

সর্বজনীন পেনশনের বিষয়টি হলো না এবারও; সামাজিক নিরাপত্তায় নেই শ্রমিকমুখী কোন বিশেষ প্রকল্প

২০১৮-এর মতোই ২০১৯-২০ সালের বাজেটেও সর্বজনীন পেনশনের বিষয়টি আশ্বাসেই আটকে ছিল। বাংলাদেশের অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমজীবী-কর্মজীবীদের অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ দাবি এটা। কিন্তু গত অর্থ বছরের বাজেটেও এই বিষয়ে কেবল আশ্বাস দেয়া হয়। সর্বশেষ অর্থ বছরেও অনুরূপভাবে বলা হয়েছে, আগামীতে 'সর্বজনীন পেনশন কর্তৃপক্ষ' গঠিত হবে। এর আগে সাবেক অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত পরপর চারটি বাজেটে সর্বজনীন পেনশনের বিষয়ে প্রয়োজনীয়তার কথা বললেও কোন কার্যকর পদক্ষেপ

নিতে দেখা যায়নি।

উল্লেখ্য, কর্মজীবী মানুষদের মধ্যে সরকারি কর্মচারি বিশ ভাগের এক ভাগ মতো। এর বাইরে আরও সামান্য সংখ্যক কর্মজীবী গ্রাচুইটি সুবিধা পান। ফলে দেশের কর্মজীবী মানুষের প্রায় ৯০ ভাগই কর্মজীবন শেষে এখনও পেনশনধর্মী কোন সুবিধা পান না।

সর্বজনীন পেনশনের মতোই সর্বশেষ বাজেটে সামাজিক সুরক্ষার আওতা ও বরাদ্দ বাড়লেও তাতে শ্রমিকমুখী কোন বিশেষ কর্মসূচি যুক্ত হতে দেখা যায়নি। ২০১৮-১৯-এর সংশোধিত বাজেটে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে ৬৪ হাজার ৪০৪ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল এবং সর্বশেষ বাজেটে সেটা ৭৪ হাজার কোটি অতিক্রম করেছে। বাজেটের ১৪ ভাগ বরাদ্দ গেছে এই খাতে। কিন্তু শ্রমজীবীদের জন্য পৃথক বিশেষ কোন হিস্যা নেই তাতে।

উল্লেখ্য, বাজেট শ্রমজীবীদের দিক থেকে হতাশাজনক হলেও শিল্প মালিকদের জন্য সেখানে কর ছাড়, রপ্তানি প্রণোদনা, ঋণ সহজীকরণ, খেলাপি ঋণ মওকুফসহ নানা সুযোগ ছিল।

প্রবাসীদের টাকা পাঠাতে উৎসাহিত করা হয়েছে; তিন কোটি কর্মসংস্থানের প্রতিশ্রুতি

এবারের বাজেটে প্রবাসীদের দেশে অর্থ পাঠানোকে উৎসাহিত করার জন্য প্রায় ৩ হাজার ৬০ কোটি টাকার প্রণোদনার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। যারা বৈধ পন্থায় রেমিট্যান্স পাঠাবেন– তাঁরা ২ শতাংশ হারে নগদ প্রণোদনা পাবেন। অর্থমন্ত্রী আরও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, প্রবাসীকর্মীদের বীমার আওতায় আনা হবে। তাঁর ভাষায় 'প্রবাসী বাংলাদেশী কর্মীদের জন্য বীমা সুবিধা না থাকায় দুর্ঘটনা ও নানাবিধ কারণে তাঁরা ও তাদের পরিবার প্রায়ই আর্থিক ক্ষতি ও ঝুঁকির সম্মুখীন হয়। প্রবাসী কর্মীদের বীমা সুবিধার আওতায় আনার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।' (বাজেট বক্তৃতা, বাংলা সংস্করণ, পৃ. ৩৫)

একই রকম প্রতিশ্রুতি এসেছে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে। বাজেটে বলা হয়েছে, ২০৩০ সালের মধ্যে তিন কোটি মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে বেকারত্বের অবসান ঘটানো হবে।

তবে সামগ্রিকভাবে সর্বশেষ বাজাটে বাংলাদেশে ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান কমিয়ে আনার কোন পরিকল্পিত উদ্যোগ ছিল না।

জাতীয় বাজেট প্রণেতাদের কাছে শ্রমজীবীদের প্রত্যাশা ছিল নিম্নরূপ:

- জাতীয় মজুরি কমিশন/নিম্নতম মজুরী বোর্ডকে শক্তিশালী করা ও পূনর্গঠনের লক্ষ্যে জাতীয় বাজেটে বরাদ্দ রাখা;
- শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য সুরক্ষার লক্ষ্যে বিশেষায়িত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা;
- শ্রমিকদের জন্য রেশনিং ব্যবস্থা চালুর লক্ষ্যে বাজেটে সুনির্দিষ্ট বরাদ্দ রাখা; এক্ষেত্রে প্রয়োজনে পাবলিক-প্রাইভেট অংশীদারিত্বের ব্যবস্থা করা;
- বেসরকারি খাতের শ্রমিকের আবাসন ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট বাজেট বরাদ্দ রাখা;
- জাতীয় পেনশন স্কিম প্রণয়নের মধ্য দিয়ে সকল খাতের শ্রমিকের জন্য পেনশন ব্যবস্থা চালু করা;
- গ্রামীণ কৃষি শ্রমজীবীদের সমবায়ের মাধ্যমে বীজ উৎপাদন, বিপণন, সংরক্ষণের এবং কৃষি উপকরণ সমবায়ের মাধ্যমে বিতরণের ব্যবস্থা করা;
- দক্ষ জনশক্তি গড়তে প্রয়োজনীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান গড়তে বাজেটে বরাদ্দ রাখা;
- শ্রমজীবীদের গণপরিবহন ব্যবস্থার লক্ষ্যে বাজেটে বরাদ্দ দেয়া;
- শ্রমজীবীদের জন্য আবাসন প্রকল্প নেয়া এবং বাজেটে সেই বিষয়ে সুস্পষ্ট প্রস্তাব থাকা।

অনেকদিন ধরে উপরোক্ত দাবিসমূহ উচ্চারিত হলেও ২০১৯-এর বাজেটেও এসব বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোন প্রস্তাব ছিল না। এসব দাবি এবছরও শ্রমজীবীদের দিক থেকে প্রাসঙ্গিক। সরকার আগামী বাজেটে এসব বিষয়ে মনযোগ দেবে বলে আশা করা যায়।

বাজেটের আয়তন আসলে কতটা বেড়েছে?

বাংলাদেশ সরকারের সর্বশেষ বাজেটের আকার ৫ লক্ষ ২৩ হাজার কোটি টাকা। ক্রমে বাড়ছেও এই অংক। বাজেট প্রকাশকালে এর আকার স্বাধীনতার পর থেকে কতগুণ বেড়েছে– সে সম্পর্কে বিভিন্ন ভাষ্য প্রচার মাধ্যমে আসে। কিন্তু প্রকৃত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ বিজ্ঞানসম্মতভাবে আলোচিত হয় না।

প্রতি ডলার ৮৪ টাকা হিসেবে সর্বশেষ বাজেট অংককে ডলারে রূপান্তরিত করলে বিষয়টি নিম্নোক্ত রূপ নেয়।

৫ লাখ ২৩ হাজার কোটি টাকা = ৬২.২৬ ডলার (বাজেটকালীন প্রতি ডলার ৮৪ টাকা ধরে)

অন্যদিকে, ১৯৭২-৭৩ সালে বাজেট ছিল ৭৮৬ কোটি টাকা। প্রতি ডলার ৭.৫ টাকা হিসেবে– সে সময়কার মান ছিল:

৭৮৬ কোটি টাকা = ১.০৪৮ বিলিয়ন ডলার (৭২ সালে প্রতি ডলার ৭.৫ টাকা)।

অর্থাৎ ডলারের হিসেবে বাজেট বেড়েছে প্রায় ৬০ গুণ। টাকার হিসেবে বেড়েছে ৬৬৫ গুণ।

স্বর্ণের হিসাবে বাংলাদেশ সরকারের বাজেট কতগুণ বেড়েছে সেটাও দেখা যেতে পারে। ১৯৭২ সালে প্রতি আউন্স স্বর্ণের দাম ছিল ৪০ ডলার। এই হিসাবে ৭২ সালে বাংলাদেশ সরকারের বাজেট ছিল ২৬.২ মিলিয়ন আউন্স সমপরিমাণ। আজকে স্বর্ণের দাম প্রতি আউন্স ১৩৪০ ডলার হিসাবে ২০১৯ সালে বাংলাদেশ সরকারের বাজেট হচ্ছে ৪৬.১১৯ মিলিয়ন আউন্স সমপরিমাণ। অর্থাৎ স্বর্ণের হিসাবে বাজেট বেড়েছে ১.৭৬ গুন মাত্র। *[সংগৃহীত]*

কৃষি শ্রমিকদের গড় দৈনিক মজুরি অন্যান্য খাতের তুলনায় কম

দেশে এক বিপর্যস্থ শ্রমজীবী জনগোষ্ঠী গ্রামীণ শ্রমিকরা। চাহিদামতো মজুরি পান না তারা। সরকারি জরিপে দেখা গেছে দেশের কৃষিশ্রমিকদের গড় দৈনিক মজুরি ৩৮৬ টাকা। এই টাকা দিয়ে পরিবারের সবার জন্য চাল-ডাল, শাকসবজি কিনতে হয়। আবার জামাকাপড়সহ ছেলেমেয়ের শিক্ষা ব্যয়ও মেটাতে হয়। বছরের অনেক সময় আবার কাজও থাকে না। হয়তো সপ্তাহে পাঁচ দিন কাজ পান, বাকি দুই দিন বেকার বসে থাকেন। ২০১৯-এ প্রকাশিত কৃষি ও পল্লী পরিসংখ্যান প্রতিবেদনে উপরোক্ত তথ্য মিলেছে। এটি প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)। দেশের সব জেলার পল্লী এলাকার ৫৭ হাজার ৬০০ পরিবারের ওপর জরিপ চালিয়ে বিবিএস প্রতিবেদনটি তৈরি করেছে। এর আগে এ ধরনের জরিপ করা হয়নি।

বিবিএসের হিসাবে, সপ্তাহে এক দিন মজুরির বিনিময়ে কাজ পেলেই তাঁকে কৃষিশ্রমিক হিসেবে ধরা হয়। বর্তমানে এমন কৃষিশ্রমিক আছেন সাড়ে ৭৭ লাখ। কক্সবাজারে কৃষিশ্রমিকদের সবচেয়ে বেশি মজুরি দেওয়া হয়। সেখানে দৈনিক ৫০৭ টাকা মজুরি পান একজন শ্রমিক। আর সবচেয়ে কম মজুরি মেলে চুয়াডাঙ্গায়, ৩১২ টাকা। বিবিএসের জরিপের তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে, দেশের গড় মাথাপিঁছু আয়ের চেয়ে অনেক কম মজুরি পান কৃষি শ্রমিকেরা। বাংলাদেশের মানুষের বার্ষিক মাথাপিঁছু আয় ১ লাখ ৬০ হাজার ৬০ টাকা। সেই হিসাবে প্রত্যেকের দৈনিক মাথাপিঁছু আয় হয় ৪৩৮ টাকা।

গবেষকরা বলছেন, গত এক দশকে কৃষিশ্রমিকের প্রকৃত মজুরি কমেছে। গ্রামে কাজের সুযোগ না পেয়ে যেসব অদক্ষ শ্রমিক শহরে আসেন, সেখানেও তাঁরা মজুরি কম পান। আবার নারী কৃষি শ্রমিকরা পুরুষদের চেয়ে কম আয় করেন।

বিবিএসের জরিপের তথ্য বলছে, দেশে বর্তমানে কৃষিশ্রমিক আছেন সাড়ে ৭৭ লাখ।

তবে কৃষিশ্রমিকের গড় দৈনিক মজুরি ৩৮৬ টাকা হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করে বিবিএসের প্রকল্প পরিচালক আখতার হাসান খান প্রথম আলোকে বলেছেন, দৈনিক মজুরি হিসেবে ৩৮৬ টাকা ঠিকই আছে। ফসল তোলার সময় ৮০০ টাকায়ও কৃষিশ্রমিক পাওয়া যায় না। আবার বছরের অন্য সময়ে ৩০০ টাকায় শ্রমিক পাওয়া যায়। তিনি জানান, আরেক শ্রেণির কৃষিশ্রমিক আছেন, যাঁরা বছরভিত্তিক চুক্তিতে কাজ করেন। কৃষকের বাড়িতে তিনবেলা খাবার পান ওই শ্রমিকেরা। তাঁদের নগদ মজুরি বেশ কম। এসব কারণে গড় মজুরি কম।

নির্মাণ খাত

দুর্ঘটনা কমছে না; পরিদর্শন শুরু হচ্ছে

অনেক সময়ই মজুরির টাকা জমা থাকে ঠিকাদারের কাছে। সেই জমা থেকে কখনোই পুরোটা আদায় করা যায় না। একজন শ্রমিক বছরে গড়ে ১০ হাজার টাকা করে প্রতারণার শিকার হচ্ছেন। ৩০ লাখের অধিক শ্রমিকের ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে অংকটা অনেক বড়

নভেম্বর থেকে নিয়মিত পরিদর্শন কার্যক্রম শুরু

অতীতে 'রাজমিস্ত্রী' ও 'যোগালী' হিসেবে পরিচিত হলেও এই পেশাজীবীরা এখন নিজেদের 'নির্মাণ শ্রমিক' হিসেবেই পরিচয় দিতে আগ্রহী। বাংলাদেশে এরূপ নির্মাণ শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় ৩০ লাখের অধিক। এই শ্রমিকদের মাঝে কাজের রকমফের আছে। কেউ রডমিস্ত্রী, কেউ ইটের যোগান দেন। কেউ আবার রাজমিস্ত্রীর কাজ করেন।

অন্যতম বড় এবং উদীয়মান খাত হলেও নির্মাণ শ্রমিকদের মজুরির নির্ধারিত নিম্নতম হারের দেশব্যাপী বাস্তবায়ন তদারকির কোন কাঠামো নেই। বড় বড় কাজের ক্ষেত্রগুলোতে শ্রমিকরা দালাল ও ঠিকাদারদের মাধ্যমে যুক্ত হন। সেখানে বরাবরই মজুরির একাংশ পান ঠিকাদাররা। বঞ্চিত হন শ্রমিকরা। ২০১৯-এর ২৭ মে দৈনিক দেশ রূপান্তরের এক প্রতিবেদনে দেখা যায় একজন শ্রমিক বছরে গড়ে ১০ হাজার টাকা করে প্রতারণার শিকার হচ্ছেন। ৩০ লাখের অধিক শ্রমিকের ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে অংকটা অনেক বড়।

বর্তমানে নির্মাণ শ্রমিকদের সর্বোচ্চ দক্ষরা দিনে ৭-৮ শত টাকা মজুরি পান। হেলপাররা পান দৈনিক ৪০০ টাকা। অনেক সময়ই মজুরির টাকা জমা থাকে ঠিকাদারের কাছে। সেই জমা থেকে কখনোই পুরোটা আদায় করা যায় না।

নির্মাণ শ্রমিকদের সবচেয়ে বড় সংগঠন 'ইমারত নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন-বাংলাদেশ'। এর সদস্য সংখ্যা প্রায় ৫০ হাজার বলে দাবি করা হয়। বলাবাহুল্য, বাস্তবে অতি নগণ্য সংখ্যক শ্রমিকই ট্রেড ইউনিয়নভুক্ত। এ খাতের শ্রমিকরা এখনও অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিক হিসেবেই বিবেচিত হয়ে আসছে। ফলে শ্রম আইনের সুরক্ষাও তাদের জন্য অতি সীমিত।

নির্মাণ শ্রমিকদের কাজের ধরন অনেক ঝুঁকিপূর্ণ। বছরজুড়ে দুর্ঘটনার খবর লেগেই আছে। ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশে কাজ করা এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে থাকাই যেন তাদের নিয়তি।

কর্মক্ষেত্রে নিহত-আহত হওয়ার মতো ভয়াবহ ঘটনার পরও সংশ্লিষ্ট শ্রমিকরা প্রত্যাশিত ক্ষতিপূরণ ও আর্থিক সহায়তা পান কমক্ষেত্রেই। কয়েকটি বেসরকারি সংস্থা দেশে প্রতিবছর পেশাগত দুর্ঘটনার মিডিয়াভিত্তিক যে বাৎসরিক হিসাব তৈরি করে তাতে নির্মাণ খাতকে অন্যতম দুর্ঘটনাপ্রবণ খাত হিসেবেই দেখা যায়। মূলত স্বল্প ক্ষতিপূরণ এবং অপ্রতুল শাস্তির কারণে মালিক ও ঠিকাদাররা শ্রমিকদের নিরাপত্তার বিষয়টি অগ্রাহ্য করে চলেন।

২০১৮ সালে পরিবহন খাতের পরই নির্মাণ খাতে বেশি দুর্ঘটনা ঘটেছে। ১৬১ জন মারা গেছে। ২০১৭ সালেও নির্মাণ খাতের অবস্থান ছিল দ্বিতীয়। সে বছর মারা গিয়েছিলেন ১৩১ জন। ২০১৬ সালে মারা গিয়েছিল ৮৫ জন। কেবল নিহতের সংখ্যা বৃদ্ধি নয়– প্রতি বছরই এ খাতে আহত শ্রমিকদের সংখ্যাও বিপুলভাবে বাড়ছে।

বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার হিসাবে গত ১৫ বছরে নির্মাণকাজে দুর্ঘটনায় শ্রমিক নিহত হওয়ার সংখ্যা প্রায় ১ হাজার ৩৭৭ জন। আর ২০১৪ থেকে গত ছয় বছরে আহত হয়েছেন প্রায় ৫২৫ জন নির্মাণ শ্রমিক। প্রতিদিনই এ তালিকায় নতুন নতুন নাম যুক্ত হচ্ছে। নির্মাণ শ্রমিকদের মধ্যে স্থায়ীভাবে পংগু হওয়ার পরিসংখ্যানও উদ্বেগজনক।

নির্মাণ খাতে বাৎসরিক দুর্ঘটনায় মৃত্যুচিত্র

বছর	মারা গেছেন
২০১৯	১২৯
২০১৮	১৬১
২০১৭	১৩১
২০১৬	৮৫

পরিস্থিতি বদলাতে বিগত বছরগুলোর মতোই ২০১৯ সালেও নির্মাণ খাতের শ্রমিক সংগঠন 'ইমরাত নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন-বাংলাদেশ' ১২ দফা দাবির পক্ষে প্রচার আন্দোলন চালিয়েছে। এসব দাবির মধ্যে ছিল কর্মরত অবস্থায় নিহত হলে শ্রমিকদের ১৫ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ দেয়া, এ খাতের শ্রমিকদের জন্য রেশন ব্যবস্থা চালু করা এবং কর্মস্থলগুলোতে শ্রম আইনের তদারকি বাড়ানো।

২০১৯-এর নভেম্বর থেকে শেষোক্ত দাবির কিছু বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে বলা যায়। কলকারখানা পরিদর্শন বিভাগের কর্মকর্তারা মাসে অন্তত দুদিন কিছু কিছু নির্মাণ ক্ষেত্র পরিদর্শন করবেন বলে সিদ্ধান্ত হয়েছে। এর মধ্যে মেট্রোরেলসহ প্রতি মাসে ৪০টি নির্মাণ ক্ষেত্র পরিদর্শন করা হবে। ডিআইএফই-এর ঢাকা কার্যালয়ে ১৯ জন পরিদর্শককে এ লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য, নির্মাণ খাতের বড় অংশ আবাসন খাতের অবদান জিডিপিতে প্রায় ৮ শতাংশ। পরিসংখ্যান ব্যুরোর এ সংক্রান্ত এক জরিপ উদ্বৃত করে দৈনিক ইত্তেফাক ২০১৯-এর ২৮ সেপ্টেম্বর এক প্রতিবেদনে আরও জানিয়েছে, নির্মাণ খাতে ৩১৩২টি প্রতিষ্ঠান রয়েছে এবং তাতে প্রায় ৫ লাখ ৩৯ হাজার ব্যক্তি কাজ করছেন।

নির্মাণ খাতের আকার বাড়ছেই

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায়, ২০১১-১২ অর্থবছর দেশের নির্মাণ খাতের আকার ছিল ৪৪ হাজার ৭০০ কোটি টাকা। ২০১২-১৩ অর্থবছর তা ৪৮ হাজার ৩০০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। ২০১৩-১৪ অর্থবছর এর আকার আরো বেড়ে দাঁড়ায় ৫২ হাজার ২০০ কোটি ও ২০১৪-১৫ অর্থবছর ৫৬ হাজার ৭০০ কোটি টাকায়। নির্মাণ খাতের আকার বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত থাকে পরবর্তী বছরগুলোয়। ২০১৫-১৬ অর্থবছর খাতটির আকার বেড়ে হয় ৬১ হাজার ৫০০ কোটি ও ২০১৬-১৭ অর্থবছর ৬৭ হাজার কোটি টাকা। পরের অর্থবছর ৭৩ হাজার ৭০০ কোটি টাকায় পৌঁছে যায় নির্মাণ খাতের আকার। আর সর্বশেষ ২০১৮-১৯ অর্থবছর দেশের নির্মাণ খাতের আকার দাঁড়িয়েছে ৮০ হাজার ৬৮১ কোটি টাকায়।

নির্মাণ খাতের এ প্রবৃদ্ধিতে আবাসন খাতের অবদান থাকলেও সরকারের মেগা প্রকল্পগুলো এক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা রেখেছে।

প্রতিবেদন
সেইফটি এন্ড রাইটস ডকুমেন্টেশন বিভাগ

নির্মাণ খাত

‘শ্রমিকদের মাঝে ক্যানসার ও কিডনি রোগের প্রাদুর্ভাব বাড়ছে’

আবদুর রাজ্জাক, সাধারণ সম্পাদক
ইমরাত নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন-বাংলাদেশ (ইনসাব)

নির্মাণ খাতে আপনাদের হিসাবে শ্রমিক সংখ্যা কত?

প্রায় ৩৫ লাখ হবে। ন্যূনতম এটা। এর বেশিও হতে পারে। একেবারে গ্রাম পর্যন্ত হিসাব করা দুরূহ।

আপনাদের এই অনুমানের ভিত্তি কী?

শ্রমিক বিষয়ে যেসব সংগঠন কাজ করে তারা বিভিন্ন অঞ্চলগত যে হিসাব করেছেন তার ভিত্তিতে আমরা এটা বলছি। অনেক নির্মাণ শ্রমিক মওসুম ভেদে অন্য পেশায়ও থাকে।

কত ধরনের শ্রমিক আছে এই খাতে?

প্রায় ১০-১২ ধরনের কাজ আছে। সবচেয়ে উপরের স্তরকে আমরা বলছি রাজমিস্ত্রী। আর শুরুর শ্রমিকদের আমরা বলছি হেলপার। বহু ধরণের কাজ রয়েছে এই খাতে।

এই খাত আইনগতভাবে আনুষ্ঠানিক না অনানুষ্ঠানিক খাত হিসেবে চিহ্নিত?

শ্রম আইনে এটা অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত। তবে নির্মাণ শ্রমিকদের ‘শিল্প শ্রমিক’ হিসেবে স্বীকৃতি রয়েছে। যদিও এটা অসংগঠিত খাত হিসেবেই আইন দেখছে।

শ্রম আইনের কী সুবিধা পাচ্ছেন আপনারা?

কাজের সময় আহত ও নিহত হলে ক্ষতিপূরণ। বর্তমানে আহত হিসেবে পঙ্গুত্ব বরণ করলে আড়াই লাখ টাকা এবং নিহত হলে দুই লাখ টাকা ক্ষতিপূরণের আইন রয়েছে।

ক্ষতিপূরণের বিষয়টা আপনাদের একটা বড় দাবি ছিল। এটা ছাড়া আপনাদের আর বড় বড় দাবি কী?

আমাদের একটা বড় দাবি পেনশনের ব্যবস্থা করা। এছাড়া শ্রমিকদের জন্য বাসস্থান ও কর্মস্থলে নিরাপদে কাজ ও বসবাসের ভালো জায়গা দরকার। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে থেকে শ্রমিকরা অনেকেই কয়েক বছর পর কিডনি, ক্যানসার ইত্যাদি রোগে পড়ছে। তখন আর কাজ করতে পারছে না।

আপনাদের ইউনিয়নের সদস্য সংখ্যা কত? এই ইউনিয়নে সদস্য হলে শ্রমিকদের সুবিধা কী হবে?

প্রায় ৫০ হাজার সদস্য। একটা বড় সুবিধা হলো আহত-নিহত হলে ক্ষতিপূরণ পাওয়ার ক্ষেত্রে সহায়তা দেই আমরা। তার কাগজপত্র প্রস্তুত করে দিই। এ পর্যন্ত অন্তত সাড়ে চার শত শ্রমিককে আমরা শ্রমিক কল্যাণ ফান্ড থেকে ক্ষতিপূরণ পেতে সাহায্য করেছি। এছাড়া সংগঠিত হওয়া ছাড়া দাবি আদায় করা যাবে না– শ্রমিকদের এটা বুঝতে হবে।

২০১৯ সালে এ পর্যন্ত আপনাদের ইউনিয়ন এই খাতের শ্রমিকদের জন্য কী কী কর্মসূচি নিয়েছে?

এখন আমাদের বড় দাবি পেনশন ও শ্রমিকদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধা বাড়ানো। স্মারকলিপি দিয়েছি। মিছিল মিটিংয়ে এসব বলা হচ্ছে।

সরকার কোন প্রতিশ্রুতি দিয়েছে?

সরকার তো ২০১৬ থেকে বলছে অসংগঠিত খাতের শ্রমিকদের জন্যও পেনশনের ব্যবস্থা করবে। কিন্তু কিছু তো এখনও দেখছি না। কিন্তু আমরা বলে যাবো।

আপনাদের ইউনিয়ন কবে থেকে সংগঠন হিসেবে অনুমোদন পেয়েছেন?

আমাদের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ১৯৭১। আমরা ১৯৯৩-এ এই অনুমোদন পেয়েছি।

শ্রম আদালতে মামলার পাহাড়

ছয় বছর পুরানো মামলাও রয়েছে

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) হিসাব অনুযায়ী, বাংলাদেশে বর্তমানে শ্রমজীবীর সংখ্যা ছয় কোটি ৩২ লাখ। এত বিপুল শ্রমজীবীর দেশে বছরের মাঝামাঝি পর্যন্ত শ্রম আদালত কাজ করছিল মোটে সাতটি। ফলে দেশের শ্রম আদালতগুলোতে মামলার স্তুপ বাড়তে বাড়তে ১৭-১৮ হাজারে পৌঁছেছে ২০১৯ সালে।

২০১৯ সালের মার্চ মাসের এক হিসাবে দেখা যায়, সাত শ্রম আদালত ও একটি আপিল ট্রাইব্যুনাল মিলে বিচারাধীন মামলা রয়েছে ১৭ হাজার ৬০৮টি। আপিল ট্রাইব্যুনালে রয়েছে ১ হাজার ৪৭টি মামলা। এর মাঝে ঢাকার প্রথম শ্রম আদালতে বিচারাধীন রয়েছে ৪ হাজার ৫৭৬টি মামলা, দ্বিতীয় শ্রম আদালতে রয়েছে ৫ হাজার ২৬৩ এবং ঢাকার তৃতীয় শ্রম আদালতে ৪ হাজার মামলা আছে। চট্টগ্রামের প্রথম শ্রম আদালতে আছে ১ হাজার ৫১০টি এবং দ্বিতীয় শ্রম আদালতে আছে ৫৭৮টি মামলা বিচারাধীন। এর বাইরে খুলনার শ্রম আদালতে আছে ২১৪টি ও রাজশাহীর শ্রম আদালতে ৪১৫টি মামলা বিচারাধীন আছে। চট্টগ্রামের অভিজ্ঞতায় জানা যায়, সেখানে ১ হাজারের বেশি মামলা রয়েছে যেগুলো ছয় বছর পুরানো।

২০০৬ সালের শ্রম আইন অনুযায়ী শ্রম আদালত গঠিত। জেলা জজ পদমর্যাদার একজন বিচারক আদালতগুলোতে চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। চেয়ারম্যানের সঙ্গে মালিক ও শ্রমিক প্রতিনিধি থাকেন একজন করে। এভাবেই সমন্বয় করে গঠিত হয় বিচারক প্যানেল। তবে অনেক ক্ষেত্রে প্রধান বিচারক ব্যতীত অন্য দুজন উপস্থিত থাকেন না বিধায় মামলার নিষ্পত্তিতে বিলম্ব ঘটে বলে অনেকের দাবি।

আরও তিনটি শ্রম আদালত বাড়লো

বর্তমানে ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও খুলনায় পুরানো সাতটি শ্রম আদালতের পাশাপাশি রংপুর, বরিশাল ও সিলেটেও তিনটি নতুন আদালত কাজ করছে। ২০১৯-এর জুনে এসব আদালতের গেজেট জারি করে মন্ত্রণালয়। এর ফলে উল্লিখিত তিনটি বিভাগীয় শহরের শ্রমজীবীরা উপকৃত হবেন বলে আশা করা যায়।

শ্রম-সংক্রান্ত মামলার একমাত্র আপিল ট্রাইব্যুনালের অবস্থান ঢাকায়। অর্থাৎ দূর-দূরান্তের জেলাগুলো থেকে শ্রমিকদের আপীল মামলাগুলোতে লড়তে ঢাকায় আসতে হবে। যা অনেক শ্রমিকের জন্যই কার্যত অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। ফলে যথাযথ বিচার বঞ্চিত হচ্ছে মনে করেও তারা আর মামলা করে না।

শ্রম আদালতে প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের নিয়োগ দেয় শ্রম ও

কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, আর বিচারক নিয়োগের বিষয়টি আইন মন্ত্রণালয়ের হাতে। ফলে একধরনের দ্বৈত শাসনের সৃষ্টি হয়, এমন কথাও বলেন একাধিক বিশেষজ্ঞ।

বহু মামলা খারিজ হয়ে যাচ্ছে

সর্বশেষ বছরে শ্রম আদালতে শ্রমিকদের জন্য একটা বড় সমস্যা হিসেবে দেখা গেছে মৌখিক চাকরিচ্যুতির বিষয়ে মামলা গ্রহণ করতে আদালতের অপরাগতা। বলা হচ্ছে, এই বিষয়ে উচ্চ আদালতের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। এ কারণে উক্ত সমস্যাজনিত বহু মামলা খারিজ হয়ে যাচ্ছে।

সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের সভাপতি রাজেকুজ্জামান রতন এ প্রসঙ্গে দৈনিক দেশ রূপান্তরকে বলেছেন, মৌখিকভাবে কাউকে চাকরিচ্যুত করা যাবে না বলে আদেশ দিয়েছিল উচ্চ আদালত। করলে সেটা গ্রহণযোগ্য হবে না। অর্থাৎ শ্রমিক চাকরি চালিয়ে যেতে পারবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এই আদেশের ভুল ব্যাখ্যা হচ্ছে। মালিকরা এর সুযোগ নিচ্ছেন। আইনজীবীরাও এটা পরিষ্কার করতে পারছেন না।

ভুক্তভোগীদের মতে, দেশের শ্রম আদালতগুলোর আরেক সমস্যা জনবল সংকট। বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট)-এর একজন আইনজীবী শ্রম আদালতে তাঁর অভিজ্ঞতা তুলে ধরে বলেন, আদালতে নিয়োগপ্রাপ্ত বিচারকরা চাকরিজীবনের শেষ মেয়াদে এখানে আসেন। এখান থেকে তাঁরা অবসরে চলে যান। তাঁরা মনে করেন 'পানিশমেন্ট' হিসেবে তাদের শ্রম আদালতে পাঠানো হয়েছে। এতে বিচারকদের মধ্যে কাজের আগ্রহ থাকে না। তরুণ বিচারক নিয়োগ দিলে আদালতগুলো আরও গতিশীল হতো।

শ্রম অধিকার নিয়ে কাজ করা সংগঠন 'সেইফটি এন্ড রাইটস' সোসাইটির নির্বাহী পরিচালক সেকেন্দার আলী মিনার মতে, বাংলাদেশে শ্রমিক সংখ্যা ও শ্রম আইন লঙ্ঘনের তুলনায় আদালতে যে পরিমাণ মামলা আছে তা বেশি নয়। অথচ এই মামলার সুরাহা করতেও হিমশিম খেতে হচ্ছে আদালতকে। আইন অনুযায়ী ১৮০ দিনের মধ্যে মামলা নিস্পত্তির কথা থ াকলেও কখনো কখনো তা পাঁচ বছর পেরিয়ে যাচ্ছে। এর বড় কারণ বিচারক স্বল্পতা। যেসব আদালত আছে সেগুলোতেও অনেক সময় অবকাঠামো ও জনবল সংকট থাকে। একজন বিচারক অবসরে গেলে অনেক সময় কিছুদিন আদালত বিচারকশূন্য থাকে। আদালতের সংখ্যা কম হওয়ায় দূরের শ্রমিকদের কার্যক্রমে অংশ নিতে ভোগান্তিতে পড়তে হয়। আবার এত কষ্ট করে আদালতে গেলেও দেখা যায়, কেউ না কেউ সময়ের আবেদন করে মামলার দিন-তারিখ বাড়িয়ে নিয়েছে। এরকম বহু ধরনের হয়রানির জন্য হাজার হাজার

বাংলাদেশে শ্রমিক সংখ্যা ও শ্রম আইন লঙ্ঘনের তুলনায় আদালতে যে পরিমাণ মামলা আছে তা বেশি নয়। অথচ এই মামলার সুরাহা করতেও হিমশিম খেতে হচ্ছে আদালতকে। আইন অনুযায়ী ১৮০ দিনের মধ্যে মামলা নিস্পত্তির কথা থাকলেও কখনো কখনো তা পাঁচ বছর পেরিয়ে যাচ্ছে। এর বড় কারণ বিচারক স্বল্পতা। যেসব আদালত আছে সেগুলোতেও অনেক সময় অবকাঠামো ও জনবল সংকট থাকে।

শ্রমিক আদালতে আসেন না।

লেবার কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশন সভাপতি এ কে এম নাসিম দৈনিক দেশ রূপান্তরকে বলেন, 'মামলার তুলনায় বিচারক ও আদালতের সংখ্যা কম এতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে এই জনবল নিয়ে মামলা নিস্পত্তির হার দ্বিগুণ করা সম্ভব– যদি বিচারিক প্রক্রিয়া সহজ করা যায়। বর্তমানে যে পদ্ধতিতে বিচার করা হয় তা অত্যন্ত জটিল ও দীর্ঘমেয়াদি। এটি সংক্ষিপ্ত করতে হবে। অনেক মামলায় সাক্ষ্যের দরকার নেই, কিন্তু আদালত সাক্ষী না পেয়ে মামলা ঝুলিয়ে রাখছে। সময় বাড়ানোর প্রবণতা থেকেও বেরিয়ে আসতে হবে।' মালিক দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের সব ক্ষেত্রে আদালতে না এসে আদালতের বাইরে বিকল্প বিরোধ নিস্পত্তির কথা বলেছেন এই আইনজীবী। তিনি বলেন, 'আইন দ্বারা সরকার কোর্টের বাইরে শ্রমিক সমস্যার নিরসন করতে পারে। সব ইস্যুতে আদালতে আসতে হবে এমন কোন কথা নেই। কোর্টের মামলাগুলো ট্রায়ালে যাওয়ার আগেও বিরোধ নিস্পত্তি করা যায়। এতে মামলা জট কমবে।'

২০১৯ সালে বাংলাদেশে ৮০ লাখ অর্থনৈতিক ইউনিটের বিপরীতে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের পরিদর্শক ছিলেন ৩২০ জন। পাঁচ বা ততোধিক কর্মী কাজ করা প্রতিষ্ঠানকে সাধারণত একটা 'ইউনিট' হিসেবে ধরা হয়। ইউনিটগুলোর মধ্যে কারখানার সংখ্যাই দুই লাখের মতো। এসব কারখানাসহ সকল অর্থনৈতিক ইউনিট পরিদর্শনের জন্য পরিদর্শন অধিদপ্তরে অনুমোদিত পদের সংখ্যা ৯৯৩টি হলেও সংস্থা এক তৃতীয়াংশ জনবল দিয়ে দেশব্যাপী দায়িত্ব পালন করছে।

দেশব্যাপী কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের কার্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ

সীমিত পরিদর্শন ও শ্রম আইন লঙ্ঘন মৃদু শাস্তিযোগ্য হওয়ায় শ্রম পরিবেশের উন্নতি হচ্ছে না

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের বর্তমান যে জনবল তাতে একটি কারখানা একবার পরিদর্শন করে এলে সিরিয়াল অনুসারে ওই কারখানা দ্বিতীয়বার ফলোআপ করতে প্রায় ১০ বছর সময় লাগার মতো অবস্থা। উপরন্তু সরকারি নীতি অনুযায়ী গার্মেন্টস খাত পরিদর্শনের বিষয়ে এত জোর দিতে হয় যে, অন্য অর্থনৈতিক ইউনিটগুলোর বিষয়ে পরিদর্শন সীমিত হয়ে পড়ে। অন্যখাতগুলোর মালিকরা আবার সীমিত পরিদর্শনের সুযোগে শ্রম আইন অবজ্ঞা করাকে একটা সুযোগ হিসেবে নিচ্ছেন। আবার রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতাশালী হওয়ায় অনেক মালিক পরিদর্শকদের তোয়াক্কা করতে চান না।

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের কাঠামোগত বিস্তৃতি সীমিত হওয়ায় সর্বশেষ বছরেও দেশে পরিদর্শন কাজকে ব্যাপকতা দেয়া যায়নি। অনেক স্থানেই একটা আঞ্চলিক কার্যালয় থেকে বহু উপজেলায় তদারকি করতে হয়। নিয়মিত শিল্প পরিদর্শন তাই প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেমন, কুমিল্লা, চাঁদপুর, নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলা নিয়ে গঠিত অঞ্চল তদারক করে পরিদর্শন অধিদপ্তরের কুমিল্লা আঞ্চলিক কার্যালয়। এখানে অনুমোদিত ৩১ পদের মধ্যে লোকবল আছে ১৩ জন। এই পাঁচজন মানুষকে দিয়ে পাঁচ জেলার শত শত অর্থনৈতিক ইউনিটের কর্মপরিবেশ তদারকি প্রায় অসম্ভব এক ব্যাপার।

আইন অনুযায়ী, দেশে কারখানা স্থাপনের আগে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের নিবন্ধন নিতে হয়। কিন্তু নিবন্ধন নেওয়া কারখানার সংখ্যা বর্তমানে ৩৪ হাজার। অর্থাৎ দেড় লক্ষাধিক প্রতিষ্ঠান আইনের ব্যত্যয় ঘটিয়েই কারখানা চালাচ্ছেন। তবে 'অপরাধ'-এর শাস্তি নিতান্তই নগণ্য। নিবন্ধনহীন কারখানা স্থাপনের দন্ড ২৫ হাজার টাকা। এর শাস্তিস্বরূপ ২০০৬ সালের শ্রম আইনের ৩০৭ ধারায় বলা হয়, 'কোনো ব্যক্তি এই আইনের কোনো বিধান লঙ্ঘন করিলে বা মানিতে ব্যর্থ হইলে এবং ইহার জন্য উহাতে অন্য কোনো দন্ডের বিধান না থাকিলে, তিনি ২৫ হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।' অদ্ভুত বিষয় হলো, কারখানা পরিদর্শনকালে মালিকপক্ষের কোনো কর্মকর্তা বাধা দিলেও শাস্তি ২৫ হাজার টাকা।

শ্রম আইনের ৩০৬ ধারার প্রথম উপধারায় বলা হয়, 'কোনো ব্যক্তি দায়িত্ব পালনরত কোনো কর্মকর্তাকে তাহার দায়িত্ব বা কর্তব্য পালনে ইচ্ছাকৃতভাবে বাধা প্রদান করিলে অথবা প্রবেশ, তদন্ত, পরীক্ষা বা পরিদর্শন করিবার জন্য যুক্তিসংগত সুযোগ দিতে ইচ্ছাকৃতভাবে অস্বীকার করিলে বা অবহেলা করিলে, তিনি ছয় মাস পর্যন্ত কারাদন্ডে অথবা ২৫ হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।'

এই দন্ড খুবই হালকা ধাঁচের হওয়ায় অনেক মালিকই পরিদর্শকদের তেমন তোয়াক্কা করেন না বলে অভিযোগ আছে। তবে শ্রমিক সংগঠকরা মনে করেন, আইনে অল্প শাস্তির বিষয় নয়– পরিদর্শকদের দৃঢ়তার অভাব এবং সীমিত পরিদর্শনই মালিকদের শ্রম আইন অবজ্ঞা করতে উৎসাহিত করে।

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর সূত্রে জানা যায় শিগগির এই সংস্থায় জনবল বাড়ানো এবং ৪২টি জেলায় কার্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এছাড়া দেশের শিল্প খাত নিরাপদ করতে আরো সাড়ে ৩ হাজার জনবল চায় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর।

শ্রমিক সংগঠকরা মনে করেন, আইনে অল্প শাস্তির বিষয় নয়– পরিদর্শকদের দৃঢ়তার অভাব এবং সীমিত পরিদর্শনই মালিকদের শ্রম আইন অবজ্ঞা করতে উৎসাহিত করে।

২০১৯ সালে দৈনিক দেশ রূপান্তরে প্রকাশিত সাংবাদিক আশরাফুজ্জামান মন্ডলের এক প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ২৭ হাজার প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করেছে। ওই বছর আইন লঙ্ঘনের দায়ে মামলা হয়েছে ১ হাজার ৪টি। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে পরিদর্শন হয় ৩২ হাজার ৯২৪ প্রতিষ্ঠান। মামলা হয় ১ হাজার ২৭৩টি। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে পরিদর্শন হয়েছে ৪২ হাজার ৬৩৯টি। মামলা হয়েছে এক হাজার ৭২২টি।

শিল্পস্থল পরিদর্শনের ক্ষেত্রে ২০১৯-এর একটা বড় অগ্রগতি হলো নির্মাণ খাতে পরিদর্শন শুরু হওয়া। নভেম্বর থেকে এই পরিদর্শন শুরু হয়। সিদ্ধান্ত হয়েছে, নির্মাণ খাতে জনসচেতনতা বাড়ানোর লক্ষে প্রতিমাসের নির্ধারিত যে কোন দুইদিন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের শ্রম পরিদর্শকগণ নিয়মিত কলকারখানা পরিদর্শনের পাশাপাশি নির্মাণ সাইট পরিদর্শন করবেন।

২০২০-এর ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত নির্মাণ সাইটের নিরাপত্তার বিষয়টি প্রাধান্য দিয়ে প্রতিমাসের ২০ ও ২১ তারিখ উপ-মহাপরিদর্শকের কার্যালয়, ঢাকার ১৯ জন শ্রম পরিদর্শক ৪০টি করে নির্মাণ সাইট পরিদর্শন করবেন। এ বিষয়ে অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শক শিবনাথ রায় এক অফিস আদেশ জারি করেছেন।

সাক্ষাৎকার

‘মালিক-শ্রমিক শ্রমআইন সম্পর্কে প্রত্যাশিত মাত্রায় সচেতন নন’

মাহফুজুর রহমান ভূইয়া, উপ-মহাপরিদর্শক
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরির্দশন অধিদপ্তর,
রাজশাহী অফিস

আপনি রাজশাহীতে অনেক শিল্পপ্রতিষ্ঠান, কলকারখানা পরিদর্শন কাজ তদারকিতে রয়েছেন। আপনার কাজের পরিসর জুড়ে প্রধান প্রধান কী কী শিল্পখাত রয়েছে?

রাজশাহীতে শিল্প প্রতিষ্ঠান, কলকারখানা পরিদর্শনের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত খাতগুলো অন্তর্ভুক্ত:

১. চালকল
২. ইট ভাটা
৩. ডায়াগনস্টিক সেন্টার
৪. হিমাগার
৫. ডালমিল
৬. জুটমিল
৭. হোটেল এবং রেঁস্তোরা (আবাসিকসহ)
৮. ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ
৯. মিষ্টির দোকান/বেকারি; ইত্যাদি।

রাজশাহী-নওগাঁ অঞ্চলে শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোর কাজের কর্ম-পরিবেশ কেমন দেখেছেন? কর্মপরিবেশের ক্ষেত্রে সেখানে মূল সংকটগুলো কীরকম?

এখানকার প্রতিষ্ঠানগুলোতে অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিক বেশি। কৃষিপ্রধান অঞ্চল। কিছু শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান রয়েছে। মানুষ শ্রমআইন সম্পর্কে খুবই অজ্ঞ। এমন কী কারখানার মালিকরাও। কর্মক্ষেত্রের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার বিষয়গুলো সম্পর্কে মালিক-শ্রমিক কেউই প্রত্যাশিত মাত্রায় সচেতন নয়। এটা মূলত রাইসমিল, ডালমিল, কোল্ড স্টোরেজ, জুটমিল প্রধান এলাকা হওয়ায় প্রচুর ধুলাবালি তৈরি হয়। কিন্তু এ ব্যাপারে মালিকরা ডাস্টস্যাকার ব্যবহার করেন না। শ্রমিকদের মাস্ক ব্যবহারও নিশ্চিত করা হয় না।

এ পুরো অঞ্চলে আপনাদের বিভাগের জনবল কত এবং এই জনবলকে কত ‘প্রতিষ্ঠান’-এর দেখাশোনা করতে হয়?

এ কার্যালয়ে বর্তমানে মোট জনবল ২০ জন। তন্মধ্যে পরিদর্শক

৯ জন (১ জন মাতৃত্বকালীন ছুটিতে ও অপর একজন দীর্ঘদিন যাবত অনুপস্থিত থাকায় তাঁর নামে বিভাগীয় মামলা চলমান)। বর্তমানে চালু রেজিস্টার্ড ও আনরেজিস্টার্ড কারখানার সংখ্যা প্রায় ৭০০-৮০০, প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ২-৩ হাজার, দোকানের সংখ্যা ২০-৩০ হাজার। বিদ্যমান ৯ জন পরিদর্শক দিয়ে উপরে উল্লিখিত সকল প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করা হলে– পরিস্থিতি সহজেই অনুমেয়। তারপরও ২০১৮-১৯ বছরে পরিদর্শন ১৬৯৯ এবং মামলা হয়েছে ১৪৯। আগামী বছর এটা আরও বাড়ানোর চেষ্টা আছে।

আপনার দৃষ্টিতে ঐ অঞ্চলের শিল্প-কলকারখানায় কর্ম পরিবেশের ক্ষেত্রে জরুরিভিত্তিতে কীরূপ সংস্কার প্রয়োজন?

প্রত্যেক জেলায় অফিস এবং জনবল বাড়ানো দরকার। কারণ এখানকার মালিক-শ্রমিক উভয়েই শ্রমআইন সম্পর্কে এখনো ততটা সচেতন নয়। একজন শ্রমিক যদি নওগাঁর সাপাহার বা বদলগাছির হয়– আর যদি তার অধিকার সম্পর্কে জানতে বা অভিযোগ দিতে প্রায় ১৪০ কি.মি দূরের রাজশাহী আসতে হয়– তাহলে তার কোন অধিকারই হয়তো পাওয়া হবে না। শ্রমিকদের পক্ষে কাজ ফেলে এভাবে অধিকারের জন্য সংগ্রাম সম্ভব নয়। এছাড়া আমাদের জন্যও এক জেলার অফিস থেকে তিন জেলার ২৭টি উপজেলার সবকিছু প্রতিদিন নজরদারি করা কষ্টকর হয়।

আরেকটি দরকারি কাজ হলো স্থায়ী বিলবোর্ডের মাধ্যমে শ্রমঘন এলাকায় এবং জনবহুল ও গুরুত্বপূর্ণ স্থান যেমন: বাজার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের পাশে, শ্রম আদালতে, বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে শ্রম আইন সম্পর্কে তথ্যাবলী টানানো।

আপনি দীর্ঘদিন রাজধানীতেও কাজ করেছেন। আপনার কী মনে হয়- আমাদের শিল্পপরিবেশ উন্নয়ন প্রচেষ্টা অতিমাত্রায় পোশাক কারখানা নির্ভর? এবং এর ফলে প্রান্তিক অঞ্চলে অন্যান্য খাতে কর্ম পরিবেশ প্রত্যাশিত মাত্রায় উন্নত হচ্ছে না?

আমাদের দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং বৈদেশিক আয়ের স্বার্থেই পোশাক কারখানায় শিল্পপরিবেশ উন্নয়নে বেশি মনোযোগ ছিল। এর ফলে অন্যান্য জায়গায় কাজ হচ্ছে না এমন না। তবে তুলনামূলকভাবে কম হওয়ার প্রধান কারণ জনবলের অভাব। যেমন এই রাজশাহী অফিস থেকে ৩টি জেলার দেখাশোনা, পরিদর্শন অধিকাংশ সময়েই ৩-৫ জনের দ্বারা সীমাবদ্ধ ছিল। এখন জনবল বাড়লেও ২ জন আবার অনুপস্থিত। প্রত্যেক অফিসে একটি হটলাইন থাকা এবং প্রত্যেক কারখানায় জনবহুল স্থানে শ্রমিকদের গুরুত্বপূর্ণ অধিকারগুলো (বেতন, ছুটি, ওভারটাইম) বিস্তারিত লিখে টাঙানো দরকার। হটলাইন থাকলে যে কেউ ফোন দিয়ে তার অভিযোগ জানাতে পারে।

শিল্পপরিবেশ উন্নয়ন বিনিয়োগ বৃদ্ধির স্বার্থে কতটা জরুরি মনে করেন? শ্রমিকদের কর্ম পরিবেশের উন্নয়ন ঘটিয়ে রাজশাহী অঞ্চলে শিল্পবিকাশের আরও সুযোগ আছে কী? সেক্ষেত্রে করণীয় কী?

বিনিয়োগ বৃদ্ধির স্বার্থে কর্মপরিবেশের উন্নয়ন ঘটানো অত্যন্ত জরুরি। কর্মপরিবেশের মানোন্নয়ন ব্যতীত শিল্পউন্নয়ন সম্ভব নয়। সুশৃঙ্খল কর্মপরিবেশ শিল্প উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগে উদ্বুদ্ধ করে। শ্রমিকদের কর্মপরিবেশ উন্নয়নের মাধ্যমে রাজশাহী অঞ্চলে শিল্পবিকাশের সুযোগ আছে বলে মনে করি। কারণ রাজশাহী শহর ইতোমধ্যে বাংলাদেশের মধ্যে পরিচ্ছন্ন নগরীর মর্যাদা লাভ করেছে। এছাড়া রাজশাহী থেকে দেশের সব অঞ্চলে সড়ক এবং রেলপথের মাধ্যমে যাতায়াতের সুব্যবস্থা রয়েছে। শ্রমিকদের কর্মপরিবেশ উন্নত হলে স্বাস্থ্যমান ভাল থাকে এবং কাজের স্পৃহা বৃদ্ধি পায়। রাজশাহী অঞ্চলে প্রচুর দক্ষ জনবল রয়েছে। রাজশাহী অঞ্চল একটি পরিবেশবান্ধব অঞ্চল। কিন্তু কর্মপরিবেশ নিরাপদ এবং উদ্যোক্তার অভাবে শিল্পের উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে। তাই সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে শিল্পপরিবেশের মানোন্নয়ন ঘটিয়ে শিল্প উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগে আগ্রহী করতে হবে। এতে যেমন শিল্পের বিকাশ ঘটবে তেমনি বেকারত্ব লাঘব হবে। তৈরি হবে দক্ষ জনবল।

রাজশাহীতে আপনাদের একটা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হচ্ছে শুনেছি?

এখানে পেশাগত দুর্ঘটনা ও পেশাগত ব্যাধি বিষয়ে গবেষণা হবে। মালিক, শ্রমিক ও ব্যবস্থাপকদের প্রশিক্ষণ হবে। প্রশিক্ষণ হবে আবাসিক। ২০২১ নাগাদ এটা উদ্বোধন হবে।

চামড়া খাত

হাজার হাজার শ্রমিকের শিল্প নগরীতে চিকিৎসা সুবিধা নেই; নেই আবাসনের ব্যবস্থা

গত বছর সাভারের চামড়া শিল্প নগরীর একটি ট্যানারিতে দুর্ঘটনাবশত সালফিউরিক এসিডের একটি ব্যারেল ভেঙে যায়। এতে চারজন শ্রমিক দগ্ধ হয়। ট্যানারি থেকে প্রায় ২০ কিলোমিটার দূরের ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে চিকিৎসার নিতে হয় তাদের। হাসপাতালে পৌঁছাতেই পেরিয়ে যায় চার ঘণ্টা। ততক্ষণে মারা যান আহতদের একজন হাসেম আলী (৩৫)।

নিহত-আহতদের সহকর্মীরা জানালেন, এই চারজন এসিডে দগ্ধ হওয়ার পর কী করব, কোথায় যাব তা নিয়ে সবাই দিশাহারা হয়ে পড়েছিল। কাছাকাছি কোনো ওষুধ এবং চিকিৎসক নেই কথিত চামড়া শিল্প নগরীতে। অথচ দ্রুত চিকিৎসা দিতে পারলে শ্রমিক হাসেম হয়তো মারা যেতেন না।

সাভারের চামড়া শিল্পাঞ্চলে চিকিৎসা সুবিধা না থাকায় এর আগেও অনেক শ্রমিক আহত হয়ে ভোগান্তির শিকার হয়েছে। ট্যানারি অঞ্চলে এরূপ দুর্ঘটনা এবং তার করুণ সমাপ্তি এখন সাধারণ বিষয়। অথচ এটা বাংলাদেশের একটা বড় শিল্পখাত। হাজার হাজার শ্রমিক রয়েছে এখানে।

কারখানা স্থানান্তর: সুযোগ সুবিধার অনুপস্থিতি

বুড়িগঙ্গা নদীকে বাঁচাতে ঢাকার হাজারীবাগের অধিকাংশ ট্যানারি সাভারে স্থানান্তর হয়েছে কয়েক বছর হলো। সাভারে ধলেশ্বরীর তীরে হরিণধরায় ২০০ একর জায়গা নিয়ে গড়ে ওঠা চামড়া শিল্প নগরীতে ১৫৫টি ট্যানারি কারখানা গড়ে তোলা হয়েছে। স্থানীয়দের হিসাবে প্রায় ২০ হাজার শ্রমিক এখানে কাজ করছেন। তবে যে প্রকল্পের অধীনে কারখানাগুলো সরানো হয়েছে, তাতে পুরো জনগোষ্ঠীর চিকিৎসা সুবিধার কোন পরিকল্পনা ছিল না। ছিল না শ্রমিকদের আবাসনের ব্যবস্থাও। অর্থাৎ শ্রমিকদের স্বাভাবিক প্রয়োজনকে বিবেচনায় না নিয়েই বিশাল এক শিল্পাঞ্চলের পরিকল্পনা করা হয়েছে। একে 'উন্নয়নের প্রতীক'ও বলা হচ্ছে।

চামড়ার কাজ খুবই বিপজ্জনক। ২০১৮ সালে আরেক ঘটনায় রাসায়নিকের ট্যাঙ্ক পড়ে দুজন শ্রমিক নিহত হয় এখানে। তাদের দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থার করা দরকার ছিল। সেটা করা যায়নি। চরম ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় কাজ করলেও দুর্ঘটনার জন্য

নামমাত্র ক্ষতিপূরণ মিলে এই খাতের শ্রমিকদের। অনেক সময় সেটাও মিলে না।

২০১৭ সালের মার্চ মাসে এক দুর্ঘটনায় ডান হাত হারান বাবুল হোসেন। তিনি বলেন, চিকিৎসায় প্রায় ৫০ হাজার টাকা খরচ হয়েছে। দুর্ঘটনার পর মালিক কথা দিয়েছিলেন কিছু টাকা দেবেন। এখন আর তিনি ফোনই ধরেন না।

শ্রম আইন অনুযায়ী, কোনো শ্রমিক কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় অক্ষম হলে তার নিয়োগদাতা ক্ষতিপূরণ হিসেবে দুই লাখ ৫০ হাজার টাকা দেয়ার কথা। গণমাধ্যমে প্রকাশিত খবরে দেখা যায়, চামড়া কারখানা সাভারে স্থানান্তরের পর বিভিন্ন দুর্ঘটনায় ৬ শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে এবং ৩০ জন বিভিন্ন পর্যায়ের আহত হয়েছে। এদের অনেকেই ক্ষতিপূরণ না পাওয়ার তথ্য দিয়েছেন।

সরকারের কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডিআইএফই)-এর কাছে জানতে চাইলে তারা বলেন, এই ধরনের তথ্য সংরক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত লোকবল নেই। ডিআইএফই-এর সহকারী মহাপরিচালক (পরিদর্শক) জাকির হোসেন বলেন, ট্যানারিতে অনেক সমস্যা আছে। আমাদের সীমিত জনবল দিয়ে পর্যবেক্ষণ করতে পারছি না। দ্রুত জনবল বাড়ানোর জন্য পরিকল্পনা করছি।

প্রচারমাধ্যম কর্মীরা বাংলাদেশ ফিনিশড লেদার গুডস

এক্সপোর্টার এসোসিয়েশন (বিএফএলএলএফইএ)-এর সভাপতি মহিউদ্দিন মাহিনের কাছে এ বিষয়ে তথ্য চাইলে তা দিতে অপারগতা প্রকাশ করে ট্যানারি শ্রমিক ইউনিয়নে যোগাযোগের পরামর্শ দেন।

দেশজুড়ে এই খাতে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে প্রায় এক লাখ শ্রমিক যুক্ত থাকলেও ৯৩ শতাংশ কর্মীর কোনো প্রশিক্ষণ নেই। প্রশিক্ষণ পাওয়ার সুযোগ ঘটে না তাদের। শ্রমিকদের মধ্যে ৬১ শতাংশ প্রায়ই ত্বকের পোড়া, শরীরের ব্যথা এবং খিটখিটে মেজাজ, এলার্জি, জ্বর, আলসার, শ্বাসযন্ত্রের সমস্যা, চোখে কম দেখা, মাথা ব্যথাসহ নানান ধরনের স্বাস্থ্য সমস্যায় ভোগেন। যাদের এই শিল্পে কমপক্ষে আট বছরের কাজের অভিজ্ঞতা রয়েছে এমন ১০৫ জন কর্মীর ওপর গবেষণা পরিচালনা করেছে একটি বেসরকারি সংস্থা। গবেষণা দলের প্রধান গবেষক শারমিন সুলতানা বলেন, আইন প্রয়োগ ও পরিদর্শনের ক্ষেত্রে শিথিলতা এবং রাসায়নিক পদার্থ ও যন্ত্রাদি পরিচালনায় শ্রমিকদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের অভাব তাদের স্বাস্থ্যঝুঁকিতে ফেলে।

বিসিক সূত্র জানায়, চামড়া শ্রমিকদের কর্মক্ষেত্রে হাসপাতাল, স্কুল ও অন্যান্য সুবিধার ব্যবস্থা করতে সরকারের কাছে ১৫০০ কোটি টাকা দাবি করেছে তারা। অর্থাৎ শ্রমিকদের সুবিধার দোহাই দিয়ে নতুন প্রকল্পের পরিকল্পনা হচ্ছে– অথচ পূর্বের প্রকল্পে কেন শ্রমিকদের আবাসন ও চিকিৎসার বিষয় থাকলো না– তার জন্য কোন জবাবদিহিতা নেই কারো।

২০২১ সাল নাগাদ এ খাত থেকে রপ্তানি আয় ৫ বিলিয়ন ডলার হবে; যদিও শ্রমিকরা লড়ছে ন্যূনতম কিছুর জন্য

শ্রমিকদের কোনো আবাসনের ব্যবস্থা না থাকায় অনেক শ্রমিক অতিকষ্টে আশপাশের বিভিন্ন এলাকায় থাকেন সাভারে। যদিও ২০১৮-এর ৬ নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ট্যানারি মালিক এবং কর্তৃপক্ষকে সময়ক্ষেপণ না করে দ্রুত শ্রমিকদের আবাসনের ব্যবস্থার নির্দেশ দিয়েছিলেন। শ্রমিকদের আবাসন, চিকিৎসা, ভালো মজুরি এবং প্রভিডেন্ট ফান্ড গঠনের লক্ষে ট্যানারি শ্রমিক ইউনিয়ন এবং বাংলাদেশ ট্যানারস এসোসিয়েসনের মধ্যে একটি সমঝোতা স্বারক (এমওইউ) স্বাক্ষর হয় ২০১৮ সালের মে মাসে। স্বাক্ষরিত এমওইউ অনুযায়ী, একজন নতুন শ্রমিক ১২ হাজার ৩৮১ টাকা এবং একজন দক্ষ শ্রমিক মাসে ২৩ হাজার টাকা মজুরি পাবে। কিন্তু মজুরি ছাড়াও শ্রমিকের রয়েছে আরও বহু প্রয়োজন। যার বাস্তবায়ন সুদূরপরাহত হয়ে আছে। মজুরির বিষয়েও রয়েছে

শ্রমিকদের অনেকের ক্ষোভ। অনেক শ্রমিক নির্ধারিত হারে মজুরি পান না। কোথাও কোথাও মাসের মজুরি মাসে মিলে না। দৈনিক দেশ রূপান্তরের ২০১৯-এর ২৭ অগাস্ট প্রকাশিত প্রতিবেদনে দেখা গেছে, চামড়া খাতের কয়েকটি কারখানায় ৩-৪ মাস পর্যন্ত মজুরি বকেয়া পড়েছে।

উল্লেখ্য, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য শিল্প দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনকারী খাত। এ খাতে প্রত্যক্ষভাবে প্রায় ৬ লাখ এবং পরোক্ষভাবে আরও ৩ লাখ মানুষ আনুষঙ্গিক কর্মকান্ডে জড়িত। দেশের মোট রপ্তানির মধ্যে এই খাতের অবদান ৪ শতাংশ, যা মোট জিডিপির ০.৫ শতাংশ। ২০১৯-এ প্রকাশিত 'চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য সংক্রান্ত সরকারি নীতিমালা'য় ২০২১ সাল নাগাদ এ খাত থেকে মোট রপ্তানি আয় বৃদ্ধি করে ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং মোট জিডিপির ২.৫ শতাংশ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। একই নীতিমালায় এও বলা হয়েছে, এই খাতের উন্নয়নের জন্য 'চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য উন্নয়ন নীতিমালা সমন্বয় পরিষদ' নামে একটি পরিষদ গঠিত হবে। এ পরিষদ চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য উন্নয়ন সংক্রান্ত নীতি-কাঠামোর জন্য সর্বোচ্চ পরিষদ হিসেবে বিবেচিত হবে। লক্ষ্যণীয় যে, প্রচারিত নীতিমালায় প্রস্তাবিত পরিষদের যে কাঠামো তুলে ধরা হয়েছে তাতে শ্রমিকদের কোন প্রতিনিধি রাখা হয়নি।

চামড়া শিল্প তিনটি উপ-খাতের সমন্বয়ে গঠিত– ট্যানারি, জুতা এবং অন্যান্য চামড়াজাত পণ্য। তবে এই সেক্টরটি ক্রমে জুতা তৈরি শিল্পের দিকে কাঠামোগতভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে। তবে চামড়া খাতের মোট শ্রমিকের ৯২ শতাংশই ট্যানারি উপ-খাতে কাজ করে। প্রায় ৬০-৭০ ভাগ শ্রমিকই এখানে অস্থায়ী ভিত্তিতে কাজ করে।

এদিকে সাভারে স্থানান্তরের পর চামড়া শ্রমিকদের অবস্থা বিষয়ে মতামত চাইলে শ্রমিক ইউনিয়ন জানিয়েছে, 'সাভারে ট্যানারি স্থানান্তরকে আমরা স্বাগত জানিয়েছিলাম। কিন্তু সেখানে পর্যাপ্ত আবাসন ব্যবস্থা না হওয়ায় শ্রমিকদের ভাড়ায় অর্থ খরচ করে সাভারে গিয়ে কাজ করতে হয়। প্রতিদিন ৬০ টাকা হিসেবে মাসে ১ হাজার ৮শ টাকা চলে যায় ভাড়ার পেছনে। স্বল্প মাসিক মজুরি দিয়ে শ্রমিকদের অনেক কষ্ট করে জীবনযাপন করতে হচ্ছে।

তথ্য সহায়তা:
ওবায়দুর রহমান, দৈনিক ভোরের কাগজ

সাক্ষাৎকার

ঘোষিত ন্যূনতম মজুরি ট্যানারি মালিকরা বাস্তবায়ন করেনি

আবুল কালাম আজাদ
সভাপতি, ট্যানারি ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন

ঢাকা থেকে সাভারে চামড়া শিল্প স্থানান্তরের পর অনেক দিন হলো। কিন্তু শোনা যাচ্ছে, শ্রমিকরা সেখানে কিছু সমস্যার মধ্যে আছে। ঠিক কী কী সমস্যার সমাধান এখনও বাকি? সেগুলোর সমাধানে বাধাটি কোথায় দেখছেন?

ট্যানারি স্থানান্তরের পর দীর্ঘদিন অতিবাহিত হলেও শ্রমিকরা সেখানে কিছু সমস্যা মোকাবেলা করেই যাচ্ছে। তার মধ্যে রয়েছে আবাসন, চিকিৎসা, ক্যান্টিন ও যাতায়াত সমস্যা। বিশেষ করে থাকা, খাওয়া ও যাতায়াতে ব্যয় খুব বেড়েছে। আর তাতে শ্রমিকরা খুব সমস্যায় পড়েছে। এর সমাধান না হওয়ার মূলে রয়েছে ট্যানারি মালিকদের মানসিকতার পরিবর্তন না হওয়া। দ্বিপাক্ষিক চুক্তিগুলো তারা বাস্তবায়ন করতে আগ্রহী নয়। নেই শ্রম আইন মানার প্রবণতা। সর্বোপরি মালিকসমাজকে সমস্যাগুলোর সমাধানে আন্তরিক মনে হচ্ছে না।

চামড়া শিল্পে মজুরি বিষয়ে সর্বশেষ যে চুক্তি রয়েছে তার যথাযথ বাস্তবায়ন হচ্ছে কী?

দ্বিপক্ষীয় চুক্তি অনুযায়ী শুধু শ্রমিকদের মজুরির বিষয়টি বাস্তবায়ন হচ্ছে। এছাড়া চুক্তির আর কোন ঐক্যমত বাস্তবায়িত হয়নি। তাছাড়া সরকার ঘোষিত ন্যূনতম মজুরিও ট্যানারি মালিকরা বাস্তবায়ন করেনি।

২০১৯ সালে আপনারা 'সিবিএ' শ্রমিকদের অবস্থার উন্নয়নে, শ্রমিকদের স্বার্থে কোন উদ্যোগ নিয়েছেন কী? ঠিক কী কী ধরনের উদ্যোগ নিয়েছেন? সেগুলো কী কোন ফল বয়ে এনেছে?

শ্রমিকদের স্বার্থে এবং শ্রমিকদের অবস্থার উন্নয়নে ২০১৯ সালের বিভিন্ন সময় ইউনিয়ন থেকে বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। তার মধ্যে রয়েছে চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন মালিকদের চিঠি দেয়া, কারখানার শ্রমিক প্রতিনিধি কর্তৃক মালিকদের মৌখিকভাবে বলা, গেইট মিটিং করা, জেনারেল মিটিং করা, শ্রমিকদের সমস্যাগুলো নিয়ে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরকে অবহিত করা এবং অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শক ও উপ-মহাপরিদর্শককে দিয়ে চামড়া শিল্প নগরীর কারখানা ও শ্রমিকদের অবস্থা সরেজমিনে পরিদর্শন করানো। এছাড়া বিষয়গুলো নিয়ে মানববন্ধন ও সংবাদ সম্মেলন করা হয়েছে। তাতে কিছুটা হলেও ফল পাওয়া গেছে। মালিকরা যেভাবে পুরানো ও দক্ষ শ্রমিকদের ছাঁটাই করা এবং অন্যান্য শ্রমিকদের বেআইনীভাবে বিনা বেতনে ঢালাওভাবে ছুটি দেয়া শুরু করেছিল তা আপাতত কিছুটা হলেও কমেছে। তবে ছাঁটাই এখনও থামেনি।

শ্রমিক প্রতিনিধিরা শ্রমিকদের বিদ্যমান সমস্যাগুলো নিয়ে মালিকদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেছেন কী এই বছর? মালিকরা ঠিক কী বলছেন?

শ্রমিকদের বিদ্যমান সমস্যাগুলো নিয়ে শ্রমিক প্রতিনিধিরা মালিক ও ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে বিভিন্ন সময় কথা বলেছেন। কিন্তু মালিকদের সেই পুরানো এক কথা: 'ব্যবসার অবস্থা খারাপ'। 'মাল বিক্রি হচ্ছে না'। ইত্যাদি। এ প্রসঙ্গে বলতে চাই, চামড়া শিল্পের জন্য তিনটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ। সেটা যেন মালিকরা ভুলে না যান। প্রথমত পরিবেশগত কমপ্লায়েন্স। দ্বিতীয়ত গুণগত কমপ্লায়েন্স। তৃতীয়ত সামাজিক কমপ্লায়েন্স। এই তিনটিকেই নিশ্চিত করে দক্ষ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ব্যবসা করতে হলে যুগোপযোগী চিন্তা করতে হবে। শ্রমিকদের কম মজুরি দিলেই ব্যবসা করে যাওয়া যাবে– এটা অতি পুরানো অসফল ধারণা আজকের দিনে। শ্রমিকদের উৎপাদনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিবেচনা না করলে ব্যবসা খারাপ হবেই। সেই দায় শ্রমিকদের ঘাড়ে চাপানো অর্থহীন।

চামড়াখাতে দুর্ঘটনাজনিত চিকিৎসা ও ক্ষতিপূরণ পাওয়ার ক্ষেত্রে শ্রমিকদের সন্তুষ্টি কেমন?

মোটামুটি। বিশেষ করে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হলে শ্রমিকরা শ্রম আইন অনুযায়ী যে ক্ষতিপূরণ পাওয়ার কথা, মালিকদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে ইউনিয়ন সেটার ফয়সালা করে থাকে। তবে ইউনিয়নের আওতার বাইরে যেসব কারখানা রয়েছে সেখানে এবং কন্ট্রাক্টরের মাধ্যমে কাজ করা শ্রমিকদের ক্ষেত্রে দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতিপূরণ পাওয়া যায় না।

চামড়াখাতে অতীতে মালিক ও শ্রমিক প্রতিনিধিদের সঙ্গে সম্পর্কের একটা সুখ্যাতি ছিল। সেটা কী বর্তমানে কোনভাবে অবক্ষয়ের শিকার? আপনার পর্যবেক্ষণ শুনতে চাচ্ছি।

অতীতে মালিক ও শ্রমিকদের মাঝে যে সুসম্পর্ক ছিল বর্তমানে মালিকদের কারণেই তাতে কিছুটা চিড় ধরেছে বলে মনে করি। এক্ষেত্রে আমার পর্যবেক্ষণ হলো, ট্যানারি শিল্প স্থানান্তর হওয়ার মধ্যদিয়ে এই শিল্পের মালিকদের মানসিকতার আরও পরিবর্তন হওয়া উচিত ছিল। বরং ট্যানারি স্থানান্তরের পর দেখা গেল মালিকদের মাঝে নিয়ম-কানুন না মানার প্রবণতা বেড়েছে। শ্রমিকদের কম দেয়ার ব্যাপারে তারা যেন আরও কঠোর হয়ে গেলেন। যার ফলে দেখা যাচ্ছে, ঢাকা শহরের হাজারিবাগ থেকে সাভার যাওয়ার পর ট্যানারি শ্রমিকদের আর্থিক অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে। মালিকরা ভেবেছিলেন সাভারে যাওয়া মানে সেটা হবে এমন এক 'অর্থনৈতিক জোন' যেখানে ট্রেড ইউনিয়ন থাকবে না। শ্রমিকদের সঙ্গে ইচ্ছামতো ব্যবহার করা যাবে। কিন্তু সেখানে ইউনিয়ন অফিস প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এবং কিছু কিছু ট্যানারিতে শ্রমিকরা ইউনিয়নের সদস্য হওয়ায় মালিকরা শ্রমিক স্বার্থের প্রশ্নে বৈরি হয়ে উঠেন এবং বিভিন্নভাবে শ্রমিক হয়রানির পথ বেছে নেন।

তবে আমরা শিল্পের স্বার্থেই মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক উন্নয়নে বিশ্বাসী। আমাদের এই অবস্থান বজায় থাকবে। আমরা চাই চামড়া খাত একটা শ্রমিক বান্ধব ও পরিবেশ বান্ধব শিল্প হোক। কিন্তু দুটোতেই ঘাটতি পড়ছে।

পাট শিল্প

খালিশপুর শ্রমিকদের লাগাতার আন্দোলন, জয়, পরাজয়, হতাশা

২০১৯ সালে বাংলাদেশের শ্রমিক অঙ্গনের একটি বড় ঘটনা ছিল খুলনার খালিশপুর অঙ্গনে জুটমিল শ্রমিকদের ধারাবাহিক আন্দোলন। মূলত বকেয়া বেতনের দাবিতে এই আন্দোলন শুরু হলেও পরে তা পাটখাতে সরকারের শিল্পনীতি-কৌশল পরিবর্তনের আন্দোলনে রূপ নিয়েছিল। প্রাথমিকভাবে আন্দোলন খানিকটা বিজয়ী হলেও পাট শিল্প খাতে নিয়ে দীর্ঘমেয়াদে তেমন কোন সংস্কার সাধিত হয়নি। বছর শেষে আবারও শ্রমিকদের মজুরি বকেয়া পড়ে। আমরণ অনশনে শ্রমিকের মৃত্যু হয়।

দীর্ঘ বকেয়ার কারণে শ্রমিকরা খাদ্যের অভাবে, চিকিৎসা সংকটে হাবুডুবু অবস্থায় পড়ে। আবার একই কারণে শ্রমিক পরিবারগুলোতে সন্তানদের শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হয়। এই আন্দোলন চলাকালে রাজনীতি সচেতন অনেক স্থানীয় তরুণ-তরুণী-শিক্ষার্থী-যুব সংগঠক এই আন্দোলনে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে শামিল হয়েছিল। তাদেরই একজন রুহুল আমিন আন্দোলনের অভিজ্ঞতা থেকে এখানে বিস্তারিত তুলে ধরেছেন:

খুলনা খালিশপুর ক্রিসেন্ট জুট মিলের আয়তন প্রায় ১১৩ একর (খুলনায় অবস্থিত দুটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়তনের থেকেও বেশি)। দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয় বড় পাটকলগুলোর একটি এটি। ১৯৫২ সালে প্রতিষ্ঠিত এ মিলে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুল, খেলার বিশাল মাঠ, শ্রমিক-কর্মচারী-অফিসারদের একাধিক ক্লাব, ফুটবল-ক্রিকেটসহ নানা মাত্রিক খেলার সরঞ্জাম ইতাদি সবই ছিল একদা। শিশুদের জন্য ছিল পার্ক, শ্রমিকদের উদ্যোগে বের হতো বাৎসরিক ম্যাগাজিন, বাৎসরিক ক্রিড়া প্রতিযোগিতাসহ নাটক ও যাত্রার দল ছিল– যারা বিভিন্ন দিবস উপলক্ষে বড় বড় অনুষ্ঠান করতো।

প্রতিদিন এ পাটকলে ১২০-১৩০ টন পাটপণ্য উৎপাদিত হত একসময়। আজো এর উৎপাদন ক্ষমতা আছে ৯০ টনের মতো। কিন্তু কাঁচামালের অভাবে দিন শেষে উৎপাদন হয় ৩০ টন। প্রায় শতভাগ আবাসিক এ পাটকলে একসময় চাকরি করতেন ১০-১২ হাজার শ্রমিক। এখন আছেন মাত্র ৬ হাজার জন। যার অর্ধেকেরও বেশি অস্থায়ী। তিন শিফটের জায়গায় কাজ চলে এখন দুই শিফটে। নিয়মিত বেতন হয় না। অনেকে তাই চাকরির পাশাপাশি অন্যকিছু করার চেষ্টা করেন। তা না হলে সংসার পরিজন নিয়ে বেঁচে থাকা দায়। অনেক শ্রমিক আবার স্ত্রী-সন্তানদের গ্রামের বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়ে মেসে একটি সিট নিয়ে থাকেন। নিজেদের রান্না করে খেতে হয় তাদের। বেতন না থাকলে এক সংগে থাকার আর্থিক উপায় থাকে না।

খালিশপুরে আসলে যা ঘটছে তা অব্যবস্থা বা অবহেলা নয়, এক ধরনের 'হত্যাকান্ড'। পরিকল্পনা করে সরকারি খাতের পাটশিল্পকে ধ্বংস করা হচ্ছে। কিন্তু দীর্ঘদেহী হওয়ার কারণে এর মরতে সময় বেশি লাগছে।

দ্রুত মধ্যআয়ের দেশের স্বীকৃতি এবং সেখান থেকে এক লাফে 'উন্নত দেশে' পৌঁছাতে ১০০টি 'ইকোনোমিক জোন' করার ঘোষণা দিয়েছে সরকার। বাস্তবায়নের উদ্যোগও চলছে ব্যাপক গতিতে। হাজার হাজার মানুষকে ভিটে মাটি থেকে উচ্ছেদ করে, কৃষিজমি ধ্বংস করে ঐ উদ্যোগ চলছে। অথচ সমস্ত আয়োজন নিয়ে প্রাণবন্ত শিল্পাঞ্চল হয়ে ওঠার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকলেও জুটমিলগুলোকে শুকিয়ে মারা হচ্ছে। স্ববিরোধী হলেও এটা তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা।

সারা বিশ্বে পাটজাত দ্রব্যের চাহিদা বাড়ার কথা শুনছি আমরা। যখন সেই চাহিদা ব্যাপক হারে বাড়ছে তখন আমাদের দেশের ব্যবসায়ীরাও তার সাথে পাল্লা দিয়ে এগিয়ে চলেছে। দিন দিন বেসরকারি পাটকলের সংখ্যাও বাড়ছে। বেসরকারি পাটকলের সংখ্যা এখন ১৭০টি। আকিজ গ্রুপ তামাকের ব্যবসা জাপানিদের কাছে বিক্রি করে দিয়ে আজ যখন পাটশিল্পের দিকে ঝুঁকছে তখন সোনালী আঁশের দেশ নামে খ্যাত আমাদের দেশের রাষ্ট্রীয় পাটকলগুলোকে লোকসান দেখিয়ে বন্ধ করে

দেওয়া হচ্ছে কিম্বা পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপের নামে বেসরকারি মালিকের হাতে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। স্বাধীনতা পরবর্তী সময় সরকারি পাটকলের সংখ্যা ছিল ৭৭টি, আজ ২৫টিতে এসে দাঁড়িয়েছে।

বর্তমানে রাষ্ট্রীয় পাটকলগুলোর অভ্যন্তরীণ অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, একটানা কাজ করতে হয় কয়েকমাস, তারপর তাকে কাজের বেতনের দাবিতে (বাড়ানোর জন্য নয়, পাওনা পেতে) আন্দোলন করতে রাজপথে থাকতে হয় পাঁচ সাত দিন থেকে একমাস পর্যন্ত। বলা বাহুল্য, এ শ্রমের তারা কোনো মজুরি পায় না। খালিশপুরে তাই হলো ২০১৯-এর শুরুতে। বছরের শেষেও সেরকম হলো। নভেম্বরে ১১ সপ্তাহের মজুরি বকেয়া পড়েছিল। যার বিরুদ্ধে শ্রমিকরা আমরণ অনশনের মতো কর্মসূচি দিতে বাধ্য হয়।

বিগত 'জাতীয় নির্বাচন'-এর পর থেকে পাটকল শ্রমিকরা বেতন না পেয়ে আন্দোলনে নামে বেশ কয়েকবার। এবার তারা কেবল বেতন নয়, মজুরি কমিশন বাস্তবায়ন, শূন্যপদে বদলি শ্রমিক স্থায়ীকরণ, পাটের মৌসুমে সময়মত অর্থবরাদ্দ ও পাটক্রয়, বিএমআর করা অর্থাৎ আধুনিক যন্ত্রাংশ ক্রয় করা, চাকরিচ্যুত বা অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিকদের শ্রম আইন অনুযায়ী এককালীন অবসর ভাতা প্রদান করাসহ নয় দফা দাবিতে আন্দোলনে নেমেছিল। মার্চ-এপ্রিল মাসে দুই দফা আন্দোলনের ফলে সরকার তাদের বকেয়া বেতন ও মজুরি কমিশন বাস্তবায়নের ঘোষণা দেয়।

এই সময় এক পর্যায়ে শ্রমিকরা নেতাদের আশ্বাস অনুযায়ী আন্দোলন স্থগিত রেখে কাজে যোগদান করে বটে– কিন্তু নির্ধারিত সময় চলে গেলেও বকেয়া মজুরি ও মজুরি কমিশন বাস্তবায়ন হয়নি।

এই ভাবে চলতে চলতে ৪ মে সকালে না খেয়ে কাজ করতে আসা একজন শ্রমিক মিলের ভেতরে তার কার্যস্থলেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায়। চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে এ খবর। খবর শুনে সব শ্রমিকরা কাজ রেখে বাইরে চলে আসে। বেতন না দেওয়া পর্যন্ত তারা আর মেশিনে হাত দিবে না বলে জানিয়ে দেয়। পরের শিফটের শ্রমিকরাও মিল গেটে এসে ফিরে যায়, ভেতরে ঢোকে না। ৬ তারিখ সকাল থেকে খুলনা অঞ্চলের ৯টি মিল এক যোগে ধর্মঘটের ডাক দিয়ে রাজপথ-রেলপথ অবরোধ করার ঘোষণা দেয়। বকেয়া বেতন ও মজুরি কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নসহ ৯ দফার এ আন্দোলন ছিল শ্রমিকদের অস্তিত্ব রক্ষার চূড়ান্ত কর্মসূচি।

প্রতিদিন বিকাল চারটার মধ্যে তিনটি মিলের শ্রমিক নেতারা আলাদা আলাদা মিছিল নিয়ে খালিশপুরের নতুন রাস্তা মোড়ে হাজির হয়ে ৪টা থেকে ৭টা পর্যন্ত অবরোধ কর্মসূচি পালন করেছেন। পাশাপাশি অবস্থান করা ৫টি মিলের কয়েক হাজার শ্রমিক এ সময় ৪টি রাস্তা ও রেলপথ বন্ধ করে দিয়ে রাস্তাতেই নামাজ আদায়, সমাবেশ করে এবং ওখানেই ইফতারি করে আন্দোলনের কর্মসূচি চালিয়ে যায়। শ্রমিকরা চাইত টানা (সকাল-সন্ধ্যা) অবরোধ করে দাবি আদায় করতে, কিন্তু নেতারা সে পথে না হেটে বিকালের মধ্যেই কর্মসূচি সীমাবদ্ধ রাখত। এভাবে আন্দোলন চলে টানা ষোলদিন। সরকারের বাইরে থাকা বামপন্থি দলগুলোর পাশাপাশি সাধারণ মানুষও এ আন্দোলনে বিভিন্নভাবে ভূমিকা রাখে।

দীর্ঘদিন ধরে চলা শ্রমিকদের এ নয় দফা দাবী আদায়ের জন্য দেশের সর্বস্তরের মানুষকে এর সঙ্গে যুক্ত করার লক্ষে বাম ছাত্র সংগঠন ও বিভিন্ন কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের উদ্যোগে 'শ্রমিক-ছাত্র-জনতা ঐক্য' নামক একটি প্লাটফর্ম গড়ে ওঠে। তাদের উদ্যোগে আয়োজন করা হয় এক সংহতি সমাবেশের।

পরিস্থিতি সামাল দিতে তাৎক্ষণিকভাবে সমাবেশে স্বয়ং জেলা প্রশাসক এসে হাজির হয়ে ঘোষণা দিতে বাধ্য হন, 'আর দুই তিন দিনের মধ্যেই সব শ্রমিকের সকল বকেয়া পরিশোধ করে দেওয়া হবে।' ২১ এপ্রিল সন্ধ্যায় প্রত্যেক মিলের নেতারা যখন গেট মিটিং করে জেলা প্রশাসকের আশ্বাসের কথা জানান তখন শ্রমিকরা রাগে গর গর করতে থাকে। পরদিন থেকে শ্রমিকরা অসন্তুষ্টি নিয়ে আবার মিলে যাওয়া শুরু করে।

ঈদের চারদিন আগে দুই ধাপে শ্রমিকদের বকেয়া মজুরি পরিশোধ করে সরকার তথা বিজিএমসি। প্রধান দাবি মজুরি কমিশনসহ অধিকাংশ দাবি থেকে যায় অনালোচিত। আর এর সাথে আবারো অনিশ্চয়তায় পথ বেয়ে পথ চলা শুরু হয় ২৫টি মিলের ৬৪ হাজার শ্রমিক পরিবারের। সেই অনিশ্চয়তাই বছর শেষে আবার দমবন্ধ করা এক পরিবেশ তৈরি করে খালিশপুরে।

পরিকল্পনা কমিশনের সমীক্ষা

‘ছদ্মবেকার’ এক কোটি পঁচিশ লাখ; অপর এক কোটি ৩৮ লাখ কাজ নিয়ে ‘অসন্তুষ্ট’

২০১৯-এ পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (জিইডি) দেশের কর্মপরিস্থিতি নিয়ে একটা সমীক্ষা প্রকাশ করেছে। পূর্ববর্তী বছরের এপ্রিল থেকে আগস্ট মাসে মাঠপর্যায়ে এ জরিপটি করে জিইডি। ৬৪ জেলার সাড়ে ১০ হাজার খানায় গিয়ে জরিপটি করা হয়। মাঠপর্যায়ের তথ্যের ভিত্তিতে ২০১৯-এর মে মাসে প্রতিবেদন চূড়ান্ত করা হয়। গবেষণাটির নাম দেয়া হয় ‘স্টাডি অন এমপ্লয়মেন্ট, প্রোডাকটিভিটি অ্যান্ড সেক্টরাল ইনভেস্টমেন্ট ইন বাংলাদেশ’। এই সমীক্ষায় বলা হয়েছে, দেশে ২০১৮ শেষে এমন ২১ লাখ তরুণ-তরুণী ছিল যারা সপ্তাহে এক ঘন্টাও কাজের সুযোগ পায় না। একই সমীক্ষা বলছে, ২০১৭ থেকে ২০১৮ এই এক বছরে দেশে সাড়ে পাঁচ লাখ বেকার কমেছে। এখনও সপ্তাহে এক ঘন্টাও কাজ না পাওয়ার মতো বেকার আছে পুরুষ ১২ লাখ, নারী ৯ লাখ। তবে গত বছর পরিসংখ্যান ব্যুরো বলেছিল, ২০১৭ সালে দেশে বেকার (সপ্তাহে এক ঘন্টাও কাজ না পাওয়া মানুষ) আছে ২৭ লাখ। সেই হিসাবের সঙ্গে মেলালে জিইডি’র প্রতিবেদন থেকে মনে হবে ২০১৭-১৮ এর মাঝে প্রায় ছয় লাখ বেকার কমেছে দেশে।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) নিয়ম অনুযায়ী, মজুরির বিনিময়ে সপ্তাহে এক ঘণ্টার কম কাজের সুযোগ পান, এমন মানুষকেই ‘বেকার’ হিসেবে ধরা হয়। বাংলাদেশের উপরোক্ত প্রতিবেদনগুলোতেও সেই সংজ্ঞা অনুযায়ীই বেকারত্বের হিসাব করা হয়েছে। তবে এই সংজ্ঞাকে আরও প্রসারিত করা হলে দেশে যে বেকারের সংখ্যা কয়েকগুণ বেশি হবে সেটা বলাই বাহুল্য। উপরোক্ত সংজ্ঞাকে বিবেচনায় নিয়ে বিবিএসের হিসাবে, দেশে ২০১৭ সালে বেকারত্বের হার ছিল ৪ দশমিক ২ শতাংশ। অন্যদিকে, জিইডি এখন বলছে, বেকারত্বের হার কমে ৩ দশমিক ১ শতাংশে নেমেছে।

বেকারের সংখ্যা কীভাবে কমল, এমন প্রশ্নের জবাবে জিইডির সদস্য শামসুল আলম সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, অর্থনীতিতে বহুমুখী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এত দিন বিবিএসের শ্রমশক্তি জরিপে এসব আসেনি। তিনি উদাহরণ দেন, ‘পাঠাও’-‘উবার’-এর মতো রাইড শেয়ারিংয়ে বিপুলসংখ্যক তরুণের কর্মসংস্থান হয়েছে। আবার শহর এলাকায় বিভিন্ন বাণিজ্যিক ও আবাসিক ভবনে নিরাপত্তার জন্য প্রাতিষ্ঠানিকভাবে কর্মী নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে।

তবে অর্থনীতিবিদ জাহিদ হোসেনের মতে, বিনিয়োগ এমন উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাড়েনি যে কর্মসংস্থানের চিত্রটি আমূল পাল্টে দিতে পারে। তাঁর মতে, বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কাজ না করে বেঁচে থাকা মুশকিল। তাই কিছু কিছু কাজ অনেকেই করছেন। কিন্তু বেকারত্বের সংজ্ঞার কারণে অনেকেই কার্যত এর হিসাব থেকে বাদ পড়ে যান। অনেকেই কাজ করছেন, কিন্তু কাজ নিয়ে সন্তুষ্ট নন। এই সংখ্যাও বিশাল ও আশঙ্কাজনক। বিপুলসংখ্যক তরুণ-তরুণী আছেন, যাঁরা কাজের মধ্যেও নেই, আবার পড়াশোনা বা প্রশিক্ষণে নেই। এটি বেশ উদ্বেগের বিষয়, শ্রমশক্তির অপব্যবহার হচ্ছে। তাই এসব বিষয়ে সরকারকে বেশি মনোযোগী হওয়ার পরামর্শ দেন তিনি। জিইডির প্রতিবেদন অনুযায়ী, যেসব তরুণ-তরুণী (১৫ থেকে ২৯ বছর বয়সী), কাজের মধ্যেও নেই, আবার পড়াশোনা বা প্রশিক্ষণেও নেই– তাঁরা আসলে ‘ছদ্ম বেকার’। দেশে এমন ছদ্মবেকারের সংখ্যা ১ কোটি ২৫ লাখ। জিইডির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এই বিশাল জনগোষ্ঠীকে কাজে লাগানো যাচ্ছে না। এ ধরনের উচ্চহারের নিষ্ক্রীয় তরুণ গোষ্ঠীর কারণে বাংলাদেশের ‘জনসংখ্যা বোনাস’-এর ঐতিহাসিক সুযোগ হুমকির মুখে পড়তে পারে এবং তা থেকে উল্টো ফল আসতে পারে।

তবে এই বিপুলসংখ্যক বেকারের বাইরেও নিজের কাজ নিয়ে সন্তুষ্ট নয় কিংবা পছন্দের কাজ পাচ্ছেন না, এমন কর্মজীবীর সংখ্যাও কম নয়। কাগজ-কলমে তাঁরা বেকার নন। জিইডির

হিসাব অনুযায়ী, সারা দেশে এমন প্রায় ১ কোটি ৩৮ লাখ তরুণ-তরুণী আছেন। তাঁদের মধ্যে পুরুষ ১ কোটি ১৫ লাখের বেশি এবং নারীর সংখ্যা প্রায় ২৩ লাখ। তাঁদের কেউ টিউশনির মতো অস্থায়ী কাজ করেন, কেউ চাকরি হারানোর শঙ্কায় আছেন। আবার কেউবা শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ পাননি। কারও কারও প্রাপ্ত মজুরিতে পোষায় না। এই ধরনের কর্মসংস্থানকে বলা হয়েছে 'আন্ডার এমপ্লয়মেন্ট'। একই প্রতিবেদন অনুযায়ী, দেশে ১৫ থেকে ৬৪ বছর বয়সী কর্মক্ষম মানুষ আছেন প্রায় ৬ কোটি ৪০ লাখ। তাঁরা কাজের জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত থাকেন। এই কর্মক্ষম মানুষের মধ্যে ৬ কোটি ১৯ লাখ মজুরির বিনিময়ে কাজ করছেন। এর মধ্যে ৪ কোটি ৫৯ লাখ পুরুষ, আর নারী ১ কোটি ৬০ লাখ। অন্যদিকে কাজহীন মানুষের সংখ্যা বিপজ্জনভাবে শহর থেকে গ্রাম বেশি বাড়ছে সেটা দেখবো আমরা পরবর্তী প্রতিবেদন থেকে।

পরিসংখ্যান ব্যুরোর কৃষি জরিপ শেষ হলো ২০১৯-এ

গ্রামে কাজে নেই পোনে এক কোটি মানুষের

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)-এর প্রথমবার করা এক কৃষি জরিপে এই তথ্য উঠে এসেছে যে– এমুহূর্তে গ্রামগুলোতে প্রায় ১৫ লাখ তরুণ-তরুণী কাজ খুঁজছে– কিন্তু পাচ্ছে না। তাঁরা সপ্তাহে এক দিনও মজুরির বিনিময়ে কাজের সুযোগ পাচ্ছেন না। কাজ না পেয়ে এসব তরুণ-তরুণী গ্রামে অনেকটা বেকার বসে আছেন।

উপরোক্ত জরিপের ফলাফল বলছে, গ্রাম এলাকার কাজ খুঁজে না পাওয়া এই মানুষদের বাইরে কোনোভাবে কাজের মধ্যেই নেই এমন মানুষের সংখ্যা আরও বেশি– ৬২ লাখ ১৫ হাজার। এরা কাজ প্রত্যাশী নন, আবার পড়াশোনা কিংবা প্রশিক্ষণও নেই তাদের। এভাবে সব মিলিয়ে কাজের মধ্যে না থাকা গ্রামাঞ্চলের মানুষের সংখ্যা দাড়িয়েছে প্রায় সাড়ে ৭৭ লাখ। এ সংখ্যা ক্রমে বাড়ছেও। এরা অনুরূপ শহুরে বেকারদের অতিরিক্ত।

অন্যদিকে, সপ্তাহে অন্তত এক দিন কাজের সুযোগ পেয়েছেন ৪ কোটি ৭০ লাখ মানুষ। গ্রামেই এদের কর্মসংস্থান

হয়েছে। কেউবা খেতে-খামারে, কেউবা মিল-কারখানায়, কেউ ছোটখাটো অন্যকিছুতে। এছাড়া প্রায় ২ কোটি ৮ লাখ পল্লীবাসী গৃহস্থালির কাজে ব্যস্ত থাকেন। এটা মজুরির বিনিময়ে কাজ নয়। এদের সিংহভাগই নারী। এর বাইরে গ্রামে পড়ুয়া ছাত্রাছাত্রী আছে প্রায় সোয়া তিন কোটি। শুধুই পড়াশোনা করেন তাঁরা।

পরিসংখ্যান ব্যুরোর এই গ্রামচিত্রের মূল দিক হলো, বর্তমান ধাঁচের উন্নয়নধারায় গ্রামের শ্রমশক্তি অব্যবহৃত থেকে যাচ্ছে। আবার বেসরকারি খাতের বিনিয়োগও এমনভাবে হচ্ছে না যাতে গ্রামে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়তে পারে। এ ছাড়া কৃষি খাতের যান্ত্রিকীকরণের ফলেও কর্মসংস্থানের সুযোগ কমছে। ধানমাড়াই, রোপণ সবই যন্ত্রের সাহায্যে হচ্ছে অনেক এলাকায়।

উল্লেখ্য, দেশে প্রথমবারের মতো কৃষি ও পল্লী পরিসংখ্যান জরিপ করেছে বিবিএস। দেশের সব জেলার পল্লী এলাকার ৫৭ হাজার ৬০০ পরিবারের ওপর জরিপ চালিয়ে উপরোক্ত তথ্যাদি পেয়েছে বিবিএস। প্রায় চার কোটি টাকা ব্যয় হয় এই জরিপে। যা শেষ হয় ২০১৯-এ। জরিপটি নীতিনির্ধারকদের জন্য ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় সহায়ক হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

এই জরিপটির ফল এমন একসময় প্রকাশিত হলো যখন প্রতিবছর দেশে গড়ে ১৮ থেকে ২০ লাখ মানুষ নতুন করে মোট জনসংখ্যায় যুক্ত হচ্ছে। সুতরাং পর্যাপ্ত শ্রমশক্তির সদ্ব্যবহার ক্রমেই দেশের সামনে একটা বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিয়েছে।

বিবিএস তাদের জরিপে এও জানিয়েছে, গ্রামে অর্ধেকের বেশি কাজের সুযোগ সৃষ্টি হয় কৃষি খাতে। ৩০ শতাংশের মতো কাজের সুযোগ আসে দোকানপাট, পরিবহনসহ বিভিন্ন সেবা খাতে। কলকারখানায় বাকি কর্মসংস্থান হয়। আবার কৃষি খাতের কর্মসংস্থানের মধ্যে ৭০ শতাংশ নিজে ও পরিবারের সদস্যরাই করেন। এমন কর্মজীবীর সংখ্যা প্রায় ১ কোটি ৭০ লাখ। বাকি ৭২ লাখ ৯১ হাজার প্রকৃত কৃষিশ্রমিক, যাঁরা মজুরির বিনিময়ে কাজ করেন। একজন কৃষি শ্রমিকের দৈনিক গড় আয় ৩৮৬ টাকা। তাঁদের প্রতিদিন গড়ে পৌনে আট ঘণ্টা কাজ করতে হয়। অবশ্য সপ্তাহে সব দিন নয়; পাঁচ দিন তাঁরা কাজ পান। বছরের দীর্ঘ সময় অনেক কৃষি শ্রমিক বেকার থাকেন।

বিবিএস বলছে, গ্রামে তিন কোটি পরিবার আছে, যার দুই-তৃতীয়াংশ কোনো না কোনোভাবে কৃষিকাজের সঙ্গে জড়িত। তবে কৃষি খাতই ওই সব পরিবারের আয়ের প্রধান উৎস নয়। কেবল কৃষির উপর নির্ভর করে এখন আর গ্রামে থাকা যাচ্ছে না। গ্রামের একটি পরিবার মাসে গড়ে আয় করে ১৬ হাজার

৮৯৩ টাকা। এই আয়ের দুই-তৃতীয়াংশই আসে অকৃষি খাত থেকে। কৃষিখাত থেকে আসে ৩৮ শতাংশ বা সাড়ে ছয় হাজার টাকা।

উল্লিখিত শুমারি দলিল থেকে আরও দেখা যায়, গ্রামের কৃষক-খামারিরা ধান-চাল, শাকসবজি, হাঁস-মুরগি, ডিমসহ বিভিন্ন পণ্য উৎপাদন করে থাকে। কিন্তু এসব পণ্য বাজারজাত করার ব্যবস্থা এখনো বেশ দুর্বল। হাটবাজারে গিয়ে সরাসরি বিক্রি করার সুযোগ কম। উৎপাদক ও বিক্রেতার মধ্যে ফড়িয়ারা ঢুকে পড়েন। অর্ধেকের বেশি কৃষক পরিবারকে নিজের বাড়িতেই ধান, চালসহ বিভিন্ন ধরনের কৃষিপণ্য বিক্রি করতে হয়। মাত্র ১৮ শতাংশ পরিবার স্থানীয় হাটবাজারে গিয়ে কৃষিপণ্য বিক্রি করতে পারে। দুই-তৃতীয়াংশ কৃষক-খামারির নিজ বাড়ি থেকে অন্তত দুই কিলোমিটারের মধ্যে হাটবাজার নেই। আবার পণ্য পরিবহনের খরচও অনেক। ফড়িয়াদের মাধ্যমে বিক্রির ফলে দামেও কিছু ঠকতে হয় খোদ উৎপাদককে।

বর্তমান ধাঁচের উন্নয়নধারায় গ্রামের শ্রমশক্তি অব্যবহৃত থেকে যাচ্ছে। আবার বেসরকারি খাতের বিনিয়োগও এমনভাবে হচ্ছে না যাতে গ্রামে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়তে পারে। এ ছাড়া কৃষিখাতের যান্ত্রিকীকরণের ফলেও কর্মসংস্থানের সুযোগ কমছে। ধানমাড়াই, রোপণ সবই যন্ত্রের সাহায্যে হচ্ছে অনেক এলাকায়।

কর্মসংস্থান চিত্র

কাজের খোঁজে বেকারদের খরচ বিপুল

চাকরির পরীক্ষার জন্য আবেদন থেকে যাতায়াত খরচ জোগাড়ে লাখ লাখ বেকারের নাভিশ্বাস অবস্থা

দেশে উচ্চশিক্ষিতদের বিরাট অংশ বেকার, প্রতি বছর তাতে যুক্ত হচ্ছে নতুন করে কম-বেশী ৫ লাখ কাজ প্রত্যাশী। এরকম ঘটনা বাংলাদেশে বিরল নয় যে–চাকরির পরীক্ষা দিতে কেন্দ্রের ফটকে গিয়ে বেকার প্রার্থীরা নোটিশ দেখেন, 'অনিবার্য কারণবশত অনির্দিষ্টকালের জন্য পরীক্ষা স্থগিত'। দূরদূরান্তের জেলাগুলো থেকে ঢাকায় এসে এরকম অবস্থায় পড়ার আর্থিক তাৎপর্য বিপুল।

এসব বেকারদের এরপর বন্ধু-বান্ধবদের মেসে রাত কাটিয়ে তবেই বাড়ি ফিরতে হয়। এতে পরীক্ষা না দিয়েই সঙ্গে নিয়ে আসা টাকা শেষ হয়– অনেকেই আবার অর্থ ধার করে আনেন।

এরকম প্রার্থীদের কেউ কেউ প্রায় প্রতি শুক্রবার ঢাকায় আসেন। কোথাও না কোথাও পরীক্ষা থাকেই। আসা-যাওয়া-থাকায় প্রতিবার প্রায় হাজার তিনেক টাকা খরচ হয়। দিনাজপুর থেকে আসা এরকম একজন জানালেন, অনার্স শেষে ২০১৭ সাল থেকে সরকারি-বেসরকারি অন্তত ৩০টি প্রতিষ্ঠানে চাকরির পরীক্ষা দিয়েছেন। আবেদন থেকে পরীক্ষা পর্যন্ত ৬০ হাজার টাকার উপরে ব্যয় হয়েছে এমনও ঘটনা আছে। টিউশনি করে নিজে চললেও এসব টাকা পরিবার থেকেই নিতে হয় বা কারো কাছ থেকে ধার করতে হয়।

চাকরির পরীক্ষার জন্য আবেদন থেকে যাতায়াত খরচ জোগাড়ে লাখ লাখ বেকারের নাভিশ্বাস অবস্থা যাচ্ছে এখন। বিভিন্ন সংস্থার তথ্যে, প্রায় ১৫ লাখ শিক্ষিত তরুণ বেকারত্বের চক্রে ঘুরপাক খাচ্ছেন। চাকরি প্রার্থী ও শ্রমবাজার সংশ্লিষ্টরা বলছেন, এসব শিক্ষিত বেকার সরকারি-বেসরকারি চাকরির পেছনে আবেদন ও কোচিং করা থেকে কয়েক ধাপে বছরে শত শত কোটি টাকা গচ্ছা দিচ্ছে। চাকরি প্রত্যাশীদের আর্থিক চাপ কমাতে বিনামূল্যে আবেদন, স্থানীয় পর্যায়ে পরীক্ষার কেন্দ্র করা, প্রয়োজনে অনলাইনভিত্তিক পরীক্ষা পদ্ধতির পরামর্শ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) ২০১৬-১৭ সালের খানা জরিপ অনুযায়ী, দেশে বেকারের সংখ্যা ২৬ লাখ ৭৭ হাজার। এদের মধ্যে ৪০ শতাংশকে উচ্চশিক্ষিত (স্নাতক পাস) বেকার বলেছে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও)। এ হিসাবে দেশে বর্তমানে ১০ লাখ ৭০ হাজার শিক্ষিত বেকার রয়েছে। বিভিন্ন সংস্থার তথ্যে, প্রতি বছর প্রায় ৫ লাখ তরুণ-তরুণী শিক্ষাজীবন শেষ করলেও, তাদের মাত্র ৫০ হাজার কর্মজীবনে যেতে পারছে। ফলে বেকারের তালিকায় প্রতি বছর নতুন প্রায় কয়েক লাখ সদস্য যোগ হচ্ছে। এই বিপুল সংখ্যক বেকার চাকরির জন্য কয়েক ধাপে অর্থ ব্যয় করছেন, নিয়মিত– যা পরিবারের ওপর বাড়তি চাপ তৈরি করছে।

অনুসন্ধানে দেখা গেছে, স্নাতকোত্তরের আগে থেকেই তরুণরা চাকরির আবেদন শুরু করে। পাস করার পর কমপক্ষে ৭ বছর চলে এ প্রক্রিয়া। এসব পরীক্ষার জন্য কোচিং, আবেদন, ব্যাংক ড্রাফট, ফটোকপি, অনলাইন খরচ, কুরিয়ার বিল বাবদ কমপক্ষে ৩ হাজার টাকা ব্যয় হয়। চলতি বছর ১৬তম বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষায় (এনটিআরসি) আবেদন করে ১০ লাখ ৩৫ হাজার জন। এর প্রতিটি ফরমের মূল্য ছিল ৩৫০ টাকা। এতে প্রতিষ্ঠানটির কোষাগারে প্রথম ধাপেই জমা পড়ে ৩৬ কোটি টাকা। কয়েক দফার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেও বছরের পর বছর ঝুলে থেকেও নিয়োগ পাওয়া যায় না। সরকারি কর্মকমিশন (পিএসসি) সূত্রে জানা গেছে, ৪০তম বিসিএসে আবেদন করেন ৪ লাখ ১২ হাজার ৫৩২ জন প্রার্থী। পিএসসিতে বিপুলসংখ্যক পরীক্ষার্থীর আবেদনের রেকর্ড এটি। কেবল আবেদন করতে প্রতি প্রার্থীকে ৭০০ টাকা পিএসসিকে দিতে হয়েছে। এ হিসাবে পিএসসি ৪০তম বিসিএসের আবেদন থেকে ২৮ কোটি ৮৭ লাখ ৭২ হাজার ৪০০ টাকা পেয়েছে। এভাবে প্রায় প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানই পরীক্ষার নামে বেকারের পকেট থেকে বিপুল অর্থ আয় করছে।

চাকরি প্রত্যাশীরা জানান, নিজের কম্পিউটার না থাকায় সাইবার ক্যাফেতে গিয়ে ফরম পূরণ করতে হয়। ছবি, প্রিন্ট, ক্যাফে বিল, ডাক কুরিয়ারসহ ৫০০ টাকার আবেদনের জন্য কমপক্ষে ১ হাজার টাকা খরচ হয়। প্রস্তুতি নিতে চাকরি সংশ্লিষ্ট বই কেনা, কোচিং করা মিলে ব্যয় ৩ হাজার টাকার উপরে পৌঁছে। এসব অর্থের সুনির্দিষ্ট পরিসংখ্যান পাওয়া না গেলেও অনেকে অনুমাননির্ভর হিসাবে বলছেন, মোট চাকরি প্রত্যাশীর এ খরচ বছরে ৩ হাজার কোটি টাকার মতো।

আছে আবেদন পরবর্তী খরচও

চাকরি প্রার্থীরা জানান, প্রাথমিক বিদ্যালয়, বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন, বিসিএসসহ বেশ কয়েকটি অধিদপ্তরের পরীক্ষা নিজ জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে হয়। তবে মন্ত্রণালয়, ব্যাংক ও

অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অধিদপ্তরে পরীক্ষা হয় ঢাকায়। এজন্য বড় ধরনের ঝক্কি পোহাতে হয় চাকরি প্রার্থীদের। পঞ্চগড় অথবা কক্সবাজার থেকে পরীক্ষার্থীদের ঢাকা আসতে হয়। এদের বেশিরভাগের ঢাকায় থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা নেই। ফলে বাধ্য হয়ে রাত জেগে ঢাকায় এসে পরীক্ষা দিয়ে ওইদিন রাতেই ফিরে যান অনেকে। এমনও দৃষ্টান্ত আছে, অনেকে শুধু চাকরির পরীক্ষা দিতেই বাসা ভাড়া করছেন ঢাকায়।

এই প্রতিবেদক যেসব প্রার্থীর সঙ্গে কথা বলেছেন, তারা প্রত্যেকে বছরে অন্তত ১৫টি চাকরির পরীক্ষা দেন, যার প্রায় ১০টিই হয় ঢাকায়। এ হিসাবে একজন প্রার্থীর বছরে ব্যয় ৩০ হাজার টাকার মতো। ফলে বেকারদের পকেট থেকে আবেদন পরবর্তী প্রক্রিয়ায় প্রায় সাড়ে ৪ হাজার কোটি টাকা খরচ হচ্ছে।

বেসরকারি খাতের অভিজ্ঞতাও সুখকর নয়

অনলাইন চাকরির আবেদন প্রতিষ্ঠান 'বিডি জবস' সূত্রে জানা গেছে, তাদের মাধ্যমে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বছরে ১৫ হাজার জব অফার দেয়। আবেদন পড়ে ২০ লাখের কাছাকাছি। এসব চাকরিতে আবেদন খরচ প্রয়োজন হয় না। তবে আবেদন পরবর্তী চাকরি প্রার্থীদের ঢাকার সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে আসতে হয়। বিভিন্ন ডকুমেন্ট জমা দিতে হয়। সম্প্রতি চট্টগ্রাম থেকে ঢাকায় আসা এক চাকরি প্রার্থী জানান, অনেকদিন ধরে একটি চাকরির জন্য ঢাকায় আসা-যাওয়া করছেন তিনি। চাকরি হচ্ছে না, শুধু টাকা নষ্ট হচ্ছে। অনেকটা বিনামূল্যের বলা হলেও বেসরকারি খাতে চাকুরি পেতে বছরে দুই থেকে আড়াই হাজার টাকা বেকাররা খরচ করছেন বলে দাবি করছেন সংশ্লিষ্টরা।

বাংলাদেশ যুব ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক খান আসাদুজ্জামান মাসুম বলেন, 'এদেশের বেশিরভাগ মানুষ গরীব। তারা সন্তানদের অনেক কষ্টে পড়ালেখা করান। এরপর রাষ্ট্রের দায়িত্ব তাদের কাজ দেওয়া। কিন্তু আমাদের রাষ্ট্রযন্ত্র সেটি না করে উল্টো পরিবারের ওপর বেকারত্বের চাপ তৈরি করছে। আবেদন থেকে নানা ধাপে চাকরি প্রত্যাশী থেকে টাকা হাতিয়ে নেওয়া হচ্ছে। শুধু তাই নয়, মেধা তালিকায় স্থান করে নেওয়ার পরও মোটা অঙ্কের উৎকোচ দিয়ে কর্মজীবনে যেতে হচ্ছে, যা খুব দুঃখজনক।' তিনি বর্তমান চাকরি পদ্ধতির সংস্কার চান। প্রয়োজনে অনলাইনভিত্তিক চাকরি পরীক্ষা পদ্ধতি চালু করে ব্যয় কমানোর পক্ষে মত দেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক এম এম আকাশ বলেন, 'বেকারদের স্বার্থেই বর্তমান নিয়োগ পদ্ধতির পরিবর্তন আনতে হবে। ন্যুনতম যোগ্যতার ভিত্তিতে চাকরির অফার দিতে হবে। এতে আবেদনের হার কমবে, খরচও সাশ্রয় হবে। চাকরি প্রার্থীকে ঢাকায় আনার প্রবণতা কমাতে হবে। অনলাইনে আবেদনের পদ্ধতিতে টাকা নেওয়ার কোনো পদ্ধতিই রাখা যাবে না।'

পরিকল্পনা কমিশনের সিনিয়র সচিব ও সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের সদস্য ড. শামসুল আলম বলেছেন, 'যে হারে প্রত্যেক বছর চাকরি প্রার্থী বাড়ছে, তার ব্যবস্থাপনা বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দেখা দিয়েছে। বিশেষ করে আর্থিক দিকটা। বেকারদের খরচ কমাতে ঢাকার বাইরে কেন্দ্র করার কথা ভাবা হলেও, প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঝুঁকি রয়েছে। তবে ডিজিটাল ব্যবস্থাপনায় আরও কীভাবে চাকুরি প্রাপ্তি সহজ করা যায়, তা নিয়ে সরকার কাজ করছে।'

আশরাফুজ্জামান মন্ডল
সাংবাদিক

বৈদেশিক কর্মসংস্থান খাত

প্রতিদিন ১১ জন প্রবাসী শ্রমিক লাশ হয়ে দেশে ফিরছে

বেড়েছে নারী শ্রমিকদের নির্যাতনের ঘটনা

শ্রমিকদের আগমন-নিগর্মন একটা স্বাভাবিক প্রক্রিয়া হলেও ২০১৯ সালে দেশে শঙ্কাজনক হারে প্রবাসী শ্রমিকদের ফেরত আসা অব্যাহত ছিল। কেবল অক্টোবর নাগাদ সৌদি আরব থেকে প্রায় ১৬ হাজার শ্রমিক ফেরত আসে। আগত শ্রমিকরা অনেকেই বলেছেন, প্রয়োজনীয় কাগজপত্র থাকার পরও তাদের ফেরত পাঠানো হয়েছে।

অন্যদিকে স্বশরীরে শ্রমিকদের ফিরে আসার চেয়েও ২০১৯-এর আরেক উদ্বেগজনক দিক ছিল প্রবাসী শ্রমিকদের লাশ হয়ে আসার ক্রমবর্ধমান প্রবণতা। বছরের মাঝামাঝি প্রকাশিত তথ্যে দেখা যাচ্ছে, প্রতিদিন গড়ে ১১ জন শ্রমিক লাশ হয়ে ফিরছেন। বছরে গড়ে তিন হাজারের অধিক মানুষের লাশ আসছে এবং লাশের আগমন সংখ্যা ক্রমে বাড়ছে। ২০০৫ সালে এরূপ লাশের সংখ্যা ছিল ১ হাজার ২৪৮। ২০১৫ সালে সেটা দাঁড়িয়েছিল দ্বিগুণেরও বেশি ৩,৩০৭।

লক্ষ্য করা যাচ্ছে, অনেক সময় শ্রমিকরা মারা গেলেও প্রশাসনিক জটিলতায় তাদের লাশ আসছে না। এসব মৃত্যুর কারণ নিয়ে বিস্তারিত কোন অনুসন্ধানও হচ্ছে না। বলা হচ্ছে, আকস্মিকভাবে মারা যাচ্ছেন তারা।

আবার সাম্প্রতিক বছরগুলোতে মৃতদের মাঝে নারী শ্রমিকের সংখ্যাও অনেক। ব্র্যাক সূত্রে সংবাদপত্রে প্রকাশিত তথ্যে দেখা গেছে, ২০১৬ সালে যেখানে নারী শ্রমিকের লাশ এসেছিল ৫৭ জনের– ২০১৮ সালে এসেছে ১১২ জনের। ২০১৬ সাল থেকে ২০১৯-এর জুন পর্যন্ত মধ্যপ্রাচ্য থেকে ৩১১ নারী শ্রমিকের লাশ বাংলাদেশে আনা হয়েছে বলে জানা যায়। এদের অধিকাংশই সৌদি আরব থেকে এসেছে। এদের মধ্যে ৫৩ জনই আত্মহত্যা করেছেন। অর্থাৎ প্রায় ১৫ ভাগ নারী শ্রমিকের মৃত্যু আত্মহত্যাজনিত। পাশাপাশি নারীশ্রমিকদের নির্যাতিত হয়ে দেশে আসার ধারাও এ বছর অব্যাহত ছিল। ২০১৯-এর ২১ জানুয়ারি দৈনিক ডেইলি স্টারের এক প্রতিবেদনে দেখা যায়, একদিনেই সৌদি আরব থেকে নির্যাতিত হয়ে ১২৮ জন নারী শ্রমিক দেশে ফিরেছেন। ২০১৯ সালের সেপ্টেম্বরে প্রথম আলোতে প্রকাশিত তথ্যে দেখা যায়, জানুয়ারি-আগস্ট সময়ে নারীশ্রমিক ফিরে আসেন ৮৫০ জন। পূর্বের বছর ২০১৮ সালে এসেছে ১ হাজার ৩৫৩ জন। এরূপ মানুষদের অনেকেই যৌন নিপীড়নের শিকার হয়েও এসেছে এবং তাঁদের নিপীড়নের কাহিনী প্রচার মাধ্যমে প্রকাশিত হওয়ার পর অনেক নাগরিক সংগঠন এর বিরুদ্ধে মিছিল, সমাবেশ ও মানববন্ধন করেছে। সৌদি আরবে সুমি আক্তার নামে জনৈকা নারী শ্রমিকের নির্যাতনের বিবরণ সামাজিক যোগাযোগ্য মাধ্যমে ভাইরাল হওয়ার পর সারা দেশে এ বিষয়ে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়। ১২ নভেম্বর জাতীয় সংসদেও এ বিষয়ে আলোচনা ও বিতর্ক হয়। এসময় সরকারি তরফ থেকে জানানো হয় যে, অবৈধ উপায়ে নারী শ্রমিক প্রেরণে জড়িত থাকার কারণে অনেক ট্রাভেল এজেন্টের সনদ বাতিল করা হয়েছে।

বছরওয়ারী প্রবাসী শ্রমিকদের মৃত্যু	
২০১২	২৮৭৮
২০১৩	৩০৭৬
২০১৪	৩৩৩৫
২০১৫	৩৩০৭
২০১৬	৩৪৮১
২০১৭	২৯১৯
২০১৮	৩০৫৭
২০১৯	(আগস্ট পর্যন্ত) ২৬১১

প্রতিদিন গড়ে প্রায় ১১ শ্রমিকের লাশ আসছে

প্রবাসী শ্রমিকদের মৃত্যুর তথ্য সংরক্ষণ করে প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড। বোর্ডের হিসাব অনুযায়ী, ২০১৯-এ বিভিন্ন দেশ থেকে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ১১ জন শ্রমিকের লাশ আসতে দেখা যাচ্ছিলো। ২০১৯-এর ৭ সেপ্টেম্বর প্রথম আলোর এক প্রতিবেদনে দেখা যায়, ঐ বছরের আগস্ট পর্যন্ত ৮ মাসে এসেছে ২ হাজার ৬১১ জন প্রবাসীর লাশ। এর মধ্যে প্রথম ছয় মাসের মৃত্যুর তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, ৬২ শতাংশই মারা গেছে স্ট্রোক বা মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণে। এরপর দুর্ঘটনায় মারা গেছেন প্রায় ১৮ শতাংশ। স্বাভাবিক মৃত্যু মাত্র ৫ শতাংশ।

ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড সূত্রে জানা গেছে, ২০১৯-এর ২৬ মার্চ সৌদি আরবের জেদ্দা কনস্যুলেট প্রবাসীদের জন্য বিনা পয়সায় চিকিৎসাসেবা দেয়া হয়। এতে ৬১৬ জন প্রবাসী কর্মী চিকিৎসা সহায়তা নেন। যার মধ্যে ৯৪ শতাংশ (৫৮১

জন) প্রবাসীর উচ্চ রক্তচাপ ও ডায়াবেটিস শনাক্ত হয়।

প্রবাসী বাংলাদেশি, অসুস্থ ও নিহতদের স্বজন এবং বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বিভিন্ন কারণে প্রবাসী স্ট্রোক, হৃদরোগ ও ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হন। যে বিপুল টাকা খরচ করে বিদেশে যান তাঁরা– সেই টাকা তুলতে অমানুষিক পরিশ্রম, দিনে ১২ থেকে ১৮ ঘণ্টা পর্যন্ত কাজ, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে গাদাগাদি করে থাকা, দীর্ঘদিন স্বজনদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকা এবং সব মিলিয়ে মানসিক চাপে ভোগেন তাঁরা। দীর্ঘদিন প্রবাসে অবস্থানকারী একজন শ্রমিক জানান, অল্প বয়সী শ্রমিকদের মাঝেই মৃত্যুর হার বেশী। এসব মৃত্যুর কারণ হিসেবে তিনি বলেন, দেশে সাধারণত তাপমাত্রা থাকে ৩২ ডিগ্রি। কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যে যারা যায় তাদের কাজ করতে হয় ৪০-এরও বেশি ডিগ্রি তাপমাত্রার মধ্যে। আবার থাকতে হয় ১০-১২ জনের এসি ছাড়া রুমে। খাবারজনিত সমস্যা তো আছেই। সেখানে গিয়ে অনেকেই চায় অল্প সময়ে বেশি কাজ করতে। কেননা তারা দেশে দেনা করে যায়, যার সুদ গুণতে হয় বেশিদিন হলেই। তাই নিজের শরীরের দিকে না তাকিয়ে অমানবিকভাবে কাজ করতে শুরু করেন তারা। আবার অনেক সময় ভাষাগত ও দক্ষতার অভাবে কাজ ছাড়তে হয়। ফলে কাজের দিক থেকেও অনিশ্চিয়তার মুখে থাকতে হয়। এতে বেড়ে যায় দুশ্চিন্তা। যার পরিণতিতে অনেকে মারাও যান।

প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড প্রবাসীদের লাশ দেশে আনতে সহযোগিতা করে। মৃত ব্যক্তিদের পরিবারগুলোকে দাফনের জন্য বিমানবন্দরে বোর্ড ৩৫ হাজার টাকা করে এবং পরে ৩ লাখ টাকা করে আর্থিক অনুদান দেয় বলে জানা গেছে।

এক অনুসন্ধানে দেখা যায়, ২০০৮ সাল থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত নয় বছরে শাহজালাল বিমানবন্দরে আসা ২২ হাজার ৫৬১ লাশের মধ্যে ৬১ শতাংশই এসেছে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো থেকে। সৌদি আরব থেকে এসেছে ২৯ শতাংশ (৬ হাজার ৫৮০ লাশ)। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ লাশ এসেছে মালয়েশিয়া থেকে। এর সংখ্যা ৩ হাজার ৯৩৮। অন্য আরেক হিসাবে দেখা গেছে, গত ১০ বছরে কেবল মালয়েশিয়া থেকেই এসেছে তিন হাজারের অধিক লাশ।

এদিকে প্রবাস থেকে আসা মৃতদের পরিবারবর্গকে সরকার যে অনুদান দেয় সেটা পেতে প্রবাসী কর্মীর স্বজনদের অনেক ধরনের কাগজপত্র দাখিল করতে হয়। অধিকাংশই এরা গ্রামে থাকেন বলে, অনেক পরিবারের জন্যই এরূপ কাগজপত্র দাখিল করে অনুদানের জন্য দীর্ঘসময় ধর্না দেয়া কঠিন হয়ে পড়ে। ক্ষতিপূরণ পাওয়ার ক্ষেত্রেও রয়েছে ব্যাপক আনুষ্ঠানিকতা।

এসব প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের মধ্যে রয়েছে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, পৌরসভার মেয়র, সিটি করপোরেশন কাউন্সিলরের কাছ থেকে দাফতরিক প্যাডে মৃতের পরিবারের সদস্য সনদ। এই সনদ সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সিটি করপোরেশন এলাকার জন্য অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষরিত হতে হয়। সংগে চারশ' টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে দায়মুক্তি সনদ, অঙ্গীকারনামা ও ক্ষমতা অর্পণপত্র থাকতে হয়। যা আবার সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, পৌরসভার মেয়র, সিটি করপোরেশনের কাউন্সিলর কর্তৃক স্বাক্ষরিত ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সিটি করপোরেশন এলাকার জন্য অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষরিত হতে হয়। সংগে থাকতে হয় মৃতের পাসপোর্টের ফটোকপি, বাংলাদেশ দূতাবাসের প্রত্যয়নপত্র, মৃত্যু সনদের (ডেথ সার্টিফিকেট) সত্যায়িত ফটোকপি। অর্থ গ্রহণকারীর ব্যাংক হিসাব নম্বরের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের প্রত্যয়নপত্র, ব্যাংক স্টেটমেন্টের মূল কপি। নাবালক সন্তান থাকলে নাবালক সন্তানের নামে খোলা ব্যাংক হিসাব নম্বর ও প্রত্যয়নপত্র (ব্যাংক স্টেটমেন্টসহ)। এছাড়া লাগে পরিবারের প্রত্যেক সদস্যের চেয়ারম্যান, কাউন্সিলরকর্তৃক সত্যায়িত এক কপি ছবি এবং সহকারী পরিচালক, জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস কর্তৃক সত্যায়িত রঙিন ছবি। এতসব কাগজপত্র যোগাড় করা অনেক শোকগ্রস্ত পরিবারের জন্যই মানসিক ও শারীরিকভাবে দুরূহ।

বৈদেশিক কর্মসংস্থান খাত

মরিয়া হয়ে ইউরোপ যাওয়ার চেষ্টা অব্যাহত; সুযোগ বেড়েছে জাপানে যাওয়ার

কাজের সন্ধানে বাংলাদেশি তরুণদের ঝুঁকি নিয়ে বিদেশ যাওয়ার চেষ্টা ২০১৯-এও ব্যাপকভাবে অব্যাহত ছিল। বছরজুড়ে বিশ্বের বিভিন্ন সাগরে ও স্থলভাগে অবৈধভাবে কাজের সন্ধানে চলাচলকালে বাংলাদেশিদের আটকের খবর পাওয়া গেছে। এরমধ্যে বিশ্বজুড়ে বারবার আলোচনায় এসেছে ভূমধ্যসাগরে জুনে ৬৪ বাংলাদেশির আটকেপড়ার সংবাদটি। পরে লিবিয়াস্থ বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত তিউনিসিয়ার উপকূলীয় শহর জারজিস থেকে ১০ কিলোমিটার দূরে সাগরে ভেসে থাকা পণ্যবাহী জাহাজে গিয়ে এই ৬৪ বাংলাদেশির সঙ্গে কথা বলেন এবং তাদের দেশে ফিরতে রাজি করান। এর আগে মে মাসে তিউনিসিয়ার উপকূলের কাছে ভূমধ্যসাগরে অভিবাসন প্রত্যাশী মানুষের আরেকটি নৌকাডুবির ঘটনায় কমপক্ষে ৬৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। ঐ ঘটনায় উদ্ধার পাওয়া জীবিতদের মাধ্যমে জানা যায়, মৃতদের অনেকেই ছিল বাংলাদেশি। পরে তাদের ৩৯ জনের নাম-ঠিকানাও মিলে।

> বাংলাদেশের নারী এবং শিশুরা মানব পাচারের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ঝুঁকি এবং বিপজ্জনক অবস্থার মধ্যে রয়েছেন। মানব পাচারকারী চক্র তাদের গৃহকর্মী হিসেবে চাকরি পাইয়ে দেয়ার মিথ্যা আশ্বাসে লেবানন, জর্ডান, সিরিয়াসহ কয়েকটি দেশে পাচার করে দিচ্ছে।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সূত্রে জানা গেছে, উদ্ধার হওয়া ১৪ বাংলাদেশি মানব পাচারের সঙ্গে জড়িত নোয়াখালী জেলার তিন ভাইয়ের নাম উল্লেখ করেছে। তাঁরা হলেন রোম্মান, রিপন ও রুবেল। এদের একটি শক্তিশালী চক্র রয়েছে লিবিয়া আর তুরস্কে। আর মাদারীপুরের কিছু মানুষও এইরূপ মানব পাচারের সঙ্গে যুক্ত। যাদের দুজনের নাম নুরী ও মিরাজ বলে জানা গেছে।

বাংলাদেশ থেকে মানব পাচারের আধিক্য নিয়ে ২০১৯-এ প্রথম আলোতে মে মাসে লিখিত রাহীদ এজাজের এক প্রতিবেদনে জানা যায়, ২০১৮ সালের অক্টোবরে মেক্সিকোর দুর্গম পথে প্রায় ২০০ বাংলাদেশি আটক হয়েছিল। যাদের গন্তব্য ছিল যুক্তরাষ্ট্র। লস অ্যাঞ্জেলেস টাইমসে ২০১৮ সালের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল, যুক্তরাষ্ট্র পৌঁছাতে আগ্রহী অবৈধ অভিবাসীদের দুবাই থেকে ব্রাজিলে নেওয়া হয়। এরপর বলিভিয়া, পেরু, ইকুয়েডর, পানামা সিটি আর গুয়াতেমালা হয়ে নেওয়া হয় মেক্সিকোতে। একইভাবে ২০১৯-এর ফেব্রুয়ারিতে ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রা দ্বীপে আটক করা হয় ১৯২ জন বাংলাদেশিকে। তাঁদের গন্তব্য ছিল মালয়েশিয়া।

আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা (আইওএম) জানিয়েছে, ভূমধ্যসাগর পেরিয়ে লিবিয়া থেকে ইউরোপে যাওয়ার পথটিই বাংলাদেশীদের জন্য সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ। ২০১৪ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত ওই পথ দিয়ে ইতালি যাওয়ার সময় প্রতি ৫০ জনে ১ জন মারা গেছে। আর এ বছরের জানুয়ারি থেকে মে মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত অন্তত ১৭ হাজার অবৈধ অভিবাসী ভূমধ্যসাগর দিয়ে ইউরোপে ঢুকে পড়েছে। এ সময়ে সাগরে হারিয়ে গেছে অন্তত ৪৪৩ জন।

দেশের উন্নয়ন আর প্রবৃদ্ধির এমন আবহে বাংলাদেশি নাগরিকদের মানব পাচারকারীদের খপ্পরে পড়ার কারণ জানতে চাইলে সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা হোসেন জিল্লুর রহমান প্রথম আলোর প্রতিবেদককে বলেছেন, 'মরিয়া হয়ে যাঁরা বিদেশ যাচ্ছেন, তাঁদের অধিকাংশই বয়সে তরুণ। তাঁদের অনেকেই হয়তো স্কুল কিংবা কলেজের পাট চুকিয়েছেন। অর্থনীতি এখন কোন ধরনের কাজের সুযোগ করে দিচ্ছে? অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতি হয়তো চায়ের দোকানে কিংবা অ্যাপভিত্তিক পরিবহন যাত্রীসেবায় কিছু তরুণের কাজের সুযোগ করে দিচ্ছে। কিন্তু বিদেশগামীরা আসলে কী ধরনের কাজ চান, সেটা নীতিনির্ধারকদের বুঝতে হবে। তারা নিজেদের জন্য উন্নত ভবিষ্যৎ চায়। মর্যাদাসম্পন্ন কাজ চায়। তাই ঝুঁকি নিয়ে বিদেশে যেতে বাধ্য হচ্ছে। প্রবৃদ্ধির উচ্চ হার দিয়ে এসব চাহিদার বিষয় পুরোপুরি বোঝা সম্ভব নয়।'

এদিকে ২০১৯-এর ২১ জুন ভয়েস অব আমেরিকার এক প্রতিবেদনে দেখা যায়, যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দফতরের 'মানব

পাচার ২০১৯' শীর্ষক প্রতিবেদনের বাংলাদেশ অংশে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের নারী এবং শিশুরা মানব পাচারের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ঝুঁকি এবং বিপজ্জনক অবস্থার মধ্যে রয়েছেন। মানব পাচারকারী চক্র তাদের গৃহকর্মী হিসেবে চাকরি পাইয়ে দেয়ার মিথ্যা আশ্বাসে লেবানন, জর্ডান, সিরিয়াসহ কয়েকটি দেশে পাচার করে দিচ্ছে।

জনশক্তি রপ্তানিতে মন্দা

বাংলাদেশের জন্য প্রবাসে বিদ্যমান শ্রমবাজারে সংকট চলছে গত কয়েক বছর যাবৎ। যার কারণে ২০১৮ সালে জনশক্তি রপ্তানি কমেছে ২৭ শতাংশ। ২০১৯-এর প্রথম মাসগুলোতেও নিম্নমুখী ধারায় ছিল শ্রম রপ্তানি। এর থেকে উত্তরণের জন্য, সবাই বলছিলেন, নতুন বাজার খোঁজার বিকল্প নেই। কিন্তু সেখানেও লক্ষণীয় কোনো সফলতা দেখা যায়নি।

জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি) সূত্রে জানা গেছে, ২০১৮ সালে বৈধভাবে বাংলাদেশ থেকে ৭ লাখ ৩৪ হাজার ১৮১ জন কর্মী কাজ নিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গিয়েছে। আগের বছর এটি ছিল ১০ লাখ ৮ হাজার ৫২৫ জন। আবার ২০১৮ সালের প্রথম প্রান্তিকে (জানুয়ারি-মার্চ) জনশক্তি রপ্তানি ছিল ২ লাখ ৪ হাজার ২০১ জন। কিন্তু ২০১৯-এর প্রথম প্রান্তিকে তা ১৯ শতাংশ কমে দাঁড়িয়েছে ১ লাখ ৬৩ হাজার ৬৯৯ জন।

বাড়তি বিমান ভাড়ায় ব্যাহত মধ্যপ্রাচ্য যাত্রা

অ্যাসোসিয়েশন অব ট্রাভেল এজেন্টস অব বাংলাদেশ (আটাব) সূত্রে জানা গেছে, বাংলাদেশ থেকে মধ্যপ্রাচ্যের বিমান ভাড়া বেড়ে গেছে দ্বিগুণের বেশি। ২৫ থেকে ৩০ হাজার টাকার ভাড়া ৬০ হাজার টাকা হয়ে গেছে। ভিসা পেয়েও অতিরিক্ত ভাড়ার জন্য অনেক শ্রমিক মধ্যপ্রাচ্যে যেতে পারে না বলে জানিয়েছে জনশক্তি ব্যবসায়ীদের সংগঠন বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্টারন্যাশনাল রিক্রুটিং এজেন্সি (বায়রা)। তবে এর মাঝে গত বছর শ্রমখাতে উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক ঘটনা ছিল জাপানে কর্মী পাঠানোর সুযোগ বৃদ্ধি। জাপানে বিশেষায়িত দক্ষ কর্মী নিয়োগের তালিকায় নবম দেশ হিসেবে যুক্ত হয়েছে বাংলাদেশ। এর আগে চীন, ইন্দোনেশিয়া, নেপাল, মিয়ানমার, ফিলিপাইন, মঙ্গোলিয়া, থাইল্যান্ড ও ভিয়েতনাম কর্মীদের নিয়েছে জাপান। ২০১৯-এ প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং জাপানের বিচার বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য, শ্রম ও কল্যাণ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, দেশটির জাতীয় পরিকল্পনা এজেন্সির মধ্যে একটি সহযোগিতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। ফলে জাপানের শ্রমবাজারে ৫ বছরের মধ্যে ৩ লাখ ৬১ হাজার ৪০০ বাংলাদেশি কর্মীর কাজের পথ সুগম হলো। এরূপ কর্মীদের মাসিক বেতন হবে প্রায় ১ লাখ ৩৫ হাজার টাকা। প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে।

সহযোগিতা স্মারক অনুযায়ী, বাংলাদেশ থেকে ১৪টি নির্দিষ্ট খাতে বিশেষায়িত দক্ষ কর্মী নেবে জাপান। আর এই কর্মীদের খরচ বহন করবে নিয়োগদাতা প্রতিষ্ঠানগুলো। জাপান দু'টি ক্যাটাগরিতে সেবা, কৃষি, শিল্প ও নির্মাণখাতে বিশেষ দক্ষ ও জাপানিজ ভাষায় পারদর্শী কর্মীদের নিয়োগ দেবে। সম্ভাব্য খাতগুলো হলো– নার্সিং কেয়ার, রেস্টুরেন্ট, কনস্ট্রাকশন, বিল্ডিং ক্লিনিং, কৃষি, খাবার ও পানীয় শিল্প, সেবা খাত, ম্যাটারিয়ালস প্রসেসিং, ইন্ডাস্ট্রিয়াল মেশিনারি, ইলেক্ট্রিক ও ইলেক্ট্রনিক্স যন্ত্রপাতি, জাহাজ নির্মাণ শিল্প, মৎস্য শিল্প, অটোমোটিভ যন্ত্রাংশ তৈরি শিল্প এবং এয়ারপোর্ট গ্রাউন্ড হ্যান্ডেলিং অ্যান্ড এয়ারক্রাফট মেনটেইনেন্স (এভিয়েশন)।

শ্রম ও কর্মসংস্থান খাতে পরিবর্তন ধারা

জলবায়ু পাল্টাচ্ছে কর্ম পরিবেশ, অর্থনীতি ও স্থানীয় জনমিতি

বহুল আলোচিত জলবায়ু পরিবর্তনের একটা বড় প্রভাব দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশের শ্রমখাতে। বিশ্বের যে কয়েকটি দেশ জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে হুমকির মুখে রয়েছে বাংলাদেশ তার মধ্যে অন্যতম।

বিশ্বব্যাংক পূর্বেই বলেছিল, দক্ষিণ এশিয়ায় জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দেশ হবে বাংলাদেশ। পুরো অঞ্চলে ২০৫০ সালের মধ্যে প্রায় ৮০ কোটি মানুষ নেতিবাচক প্রভাবের শিকার হবে। আবার বাংলাদেশেও জলবায়ু পরিবর্তনে সবেচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে শ্রমজীবী জনগোষ্ঠী। বিশেষ করে উপকূলীয় এলাকার জনগোষ্ঠী।

ইতোমধ্যে পরিবর্তন হিসেবে দেখা যাচ্ছে, এসব এলাকার লাখ লাখ শ্রমিক পুরানো প্রথাগত পেশা ছেড়ে ভাসমান শ্রমিকে পরিণত হচ্ছেন। দেশের দক্ষিণাঞ্চলীয় জেলাগুলোর কৃষিখাত থেকে ইতোমধ্যে এই সংকটে বিপুল মানুষ পেশাচ্যুত হয়েছেন। এসব জেলায় লবণাক্ততা বাড়ছে। এর ফলে প্রচুর কৃষি শ্রমিক বেকার হয়ে পড়ছে। প্রায় স্থায়ীভাবে এসব শ্রমিক ঐতিহ্যবাহী পেশা ও জনপদ ছাড়তে বাধ্য হচ্ছেন। এই অবস্থার মধ্যদিয়ে দেশের অন্যত্রও শ্রম ও মজুরির ক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয় পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশে যেসব পরিবর্তন ঘটবে তার মধ্যে আছে: তাপমাত্রা বাড়া, অতি বৃষ্টি বা অসময়ে বৃষ্টি আবার অনেক মওসুমে অনাবৃষ্টি ও খরা, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়া, ঘূর্নিঝড় বাড়া এবং দেশের ভিতরে লবণাক্ততা বাড়া।

উল্লিখিত প্রতিটি লক্ষণই শ্রমজীবীদের জন্য ক্ষতিকর। এর মধ্যে, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে প্রাকৃতিক পরিবেশনির্ভর শ্রমজীবীরা জীবিকা হারানো সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে পড়েছেন। অনেক স্থানেই প্রাকৃতিক মাছের উৎপাদন কমে যাচ্ছে। এর ফলে স্বাদু পানির মৎসজীবী, সমুদ্রগামী জেলে, উপকূলীয় জেলে ও তাদের পরিবারগুলোর জীবিকার পরিসর কমছে। এরকম ঝুঁকির কারণে কেবল কক্সবাজারেরই এক লাখ জেলে কাজ হারা এখন। দেশের জেলে প্রধান অন্যান্য এলাকায়ও একই চিত্র দেখা যাচ্ছে। চাঁদপুরের মতলব উত্তর ও মতলব দক্ষিণ উপজেলায় ভরা বর্ষায়ও অনেক বছর মেঘনা নদীতে ইলিশ মাছের দেখা পাওয়া যায় না এখন। এর ফলে মেঘনার উপকূলীয় ষাটনল জেলেপাড়া, ষটাকী, মোহনপুর, আমিরাবাদ ও কানুদী অঞ্চলের মৎস্য আড়ৎগুলো মাছশূন্য থাকার খবর পত্রিকায় এলেও সেটা যে শত শত জেলে পরিবারের বেকারত্ব তা খবর হচ্ছে না। আবার বৃষ্টিপাত কমার কারণে এই এসব এলাকার মানুষ বিশুদ্ধ খাবার পানির সংকটে পড়ছে। এটা আবার তাদের স্বাস্থ্যঝুঁকি বাড়াচ্ছে।

২০১৯-এও দেখা গেছে নিম্নচাপ ও ঘূর্ণিঝড় আসার আগে বিভিন্ন সময় সতর্ক সংকেতের কারণে জেলেদের পক্ষে সমুদ্রে মাছ ধরতে নামা সম্ভব হয়নি। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে এরূপ সতর্ক সংকেত দেয়ার ঘটনা বেড়ে যাচ্ছে। কক্সবাজার ফিশিং বোট মালিক সমিতির দেয়া তথ্য মতে, আগস্ট সেপ্টেম্বর ও অক্টোবরে জেলেরা মাত্র অল্প কয়দিন মাছ ধরতে পারেন। প্রায় প্রতিবছর এরকম ঘটছে। এ অবস্থায় অনেকেই বদলাতে শুরু করেছেন নিজেদের পেশা। কেউবা ধরছেন রিকশা চালানো, কেউবা শুরু করছেন দিনমজুরি। চকোরিয়া, মহেশখালী, লক্ষ্মীপুর, চরফ্যাশন, কলাপাড়া ও পাথরঘাটার ৩.৫ লাখ মৎস্যজীবীর মধ্যে প্রায় ২.৫ লাখ মৎস্যজীবী বর্তমানে অর্থনৈতিকভাবে পর্যুদস্ত।

কেবল জেলেরাই নয়, উপকূলের সাধারণ কৃষকরাও জলবায়ু পরিবর্তনের শিকার নানান ভাবে। জলোচ্ছ্বাসে অনেক সময়ই ধুয়ে নিয়ে যায় তাঁদের উপার্জনের একমাত্র সহায় গবাদি পশু, পাখি; নষ্ট করছে ফসলের জমি। অনেক প্রান্তিক চাষী ঋণ করে

জন্মানো ফসল হারিয়ে হয়ে পড়ছেন নিঃসম্বল। আবার খুদে শিল্পভিত্তিক উপার্জনকারীরা নিজেদের শিল্পকারখানা ধ্বংসের কারণে জীবিকার উৎস হারান।

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ঘন ঘন বন্যা বা দীর্ঘমেয়াদি বন্যাও মানুষের কাজের সুযোগ কমিয়ে দিচ্ছে। শহরাঞ্চলে দুর্বল পানি নিষ্কাষণ ব্যবস্থার কারণে জলাবদ্ধতার সময় কম আয়ের মানুষের কাজের সুযোগ কমে যায় বড় বড় শহরগুলোতে। তারপরও বাংলাদেশের প্রধান প্রধান শহরগুলোতে জলবায়ু সংকটজনিত মানুষের আগমন অব্যাহতই থাকবে আসন্ন বছরগুলোতে। এমনকি এটা ইতোমধ্যেই ঘটছে। কারণ তাদের সামনে বিকল্প আর কিছু নেই।

ইন্টারনাল ডিসপ্লেসমেন্ট মনিটরিং সেন্টার প্রকাশিত জরিপে দেখা যায়, বাংলাদেশে বিগত এক দশকে প্রতি বছর গড়ে প্রায় সাত লাখ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে। ২০০৯ সালে আইলার আঘাতে ২০০ জনের প্রাণ হারানোর কথা যতটা প্রচারিত হয়েছে– ততটা হয়নি যে, সে ঘটনায় বসত এলাকা ছেড়েছেন ১০ লাখেরও বেশি মানুষ। এমনকি অপেক্ষাকৃত স্থিতিশীল আবহাওয়ার মধ্যেও মানুষ ঘর ছেড়েছে। প্রশ্ন হলো, বাস্তুচ্যুত এতো এতো মানুষ কোথায় গেছে? ওইসব মানুষের একটা বড় অংশ অভিবাসী হয়েছে রাজধানী ঢাকায়। এরকম বেশিরভাগ মানুষ এসে নগরের বস্তি এলাকায় আশ্রয় নেন।

দারিদ্র কাটবে এবং অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা আসবে এমন ধারণা থেকেই সবাই ঢাকায় পাড়ি জমায়। দারিদ্র্য, স্বাস্থ্য সংকটসহ অন্যান্য কারণে প্রতি বছর নিম্ন আয়ের চার লাখ মানুষ ঢাকায় পাড়ি জমান। এভাবেই জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ২০৫০ সালের মধ্যে বিশ্বজুড়ে ২০ কোটি অভিবাসী তৈরি হবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। ২০১৮ সালের মার্চে বিশ্বব্যাংককর্তৃক প্রকাশিত প্রতিবেদনে আশঙ্কা করা হয়েছে, ২০৫০ সালের মধ্যে বাংলাদেশেও ৫০ লাখের উপর মানুষ বাস্তুচ্যুত হতে পারে। এদের অধিকাংশই শ্রম বিক্রি করে চলা মানুষ। এর একটি বড় কারণ ২০৫০ সাল নাগাদ সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ২০ সেন্টিমিটার বেড়ে যাবে। শুধু তাই নয়, তীব্র জোয়ারের সময় বাতাসের গতি এবং জমির ক্ষয় বেড়ে যাবে আরও কয়েক গুন বেশি।

এসবের মিলিত ফল হিসেবে ২০৫০ সালের মধ্যে বাংলাদেশের বার্ষিক দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) বর্তমানের চেয়ে অনেক কমে যাবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

এদিকে আইএলও ২০১৯-এর জুলাইয়ে বলেছে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে তাপমাত্রা বাড়ায় ২০৩০ সাল নাগাদ বিশ্বব্যাপী প্রায় আট কোটি মানুষ কর্মসংস্থান হারাবে। শ্রম ঘণ্টা কমবে প্রায় ২ দশমিক ২ শতাংশ। অর্থনৈতিক ক্ষতি

হবে প্রায় ২ লাখ ৪০ হাজার কোটি মার্কিন ডলারের। এর একাংশ ঘটবে বাংলাদেশেও। উপরোক্ত পরিস্থিতিরই আভাস দিলেন পকিল্পনামন্ত্রী এম এম মান্নান ২০১৯-এর মে মাসে জাতিসংঘের এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কমিশনের (ইউএন এসকাপ) বার্ষিক সভায়। সেখানে তিনি বলেন, 'জলবায়ু শরণার্থী' সংকট মোকাবেলা ও টেকসই নগরায়ণ বাংলাদেশের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এদিকে প্রথম আলোর এক প্রতিবেদনে দেখা যায়, সব জেলার মধ্যে বাংলাদেশের ১৬টি জেলায় অভিবাসী মানুষেরা বেশি ভিড় করছেন। অন্য জেলা থেকে এসব জেলায় মানুষ বেশি আসে, যায় কম। পূর্বাঞ্চলে এমন জেলার সংখ্যা ১১টি। এগুলো হচ্ছে ঢাকা, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, সিলেট, চট্টগ্রাম, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, রাঙামাটি, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ ও নরসিংদী। মোট অভিবাসীদের ৬৯ শতাংশই এসব জেলায় আসেন। অন্যদিকে পশ্চিমাঞ্চলে এমন জেলার সংখ্যা মাত্র পাঁচটি। এগুলো হচ্ছে জয়পুরহাট, পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, খুলনা ও রাজবাড়ি। আবার জাগো নিউজ সংস্থা তাদের এক প্রতিবেদনে পরিসংখ্যান ব্যুরোকে উদ্বৃত করে বলেছে, জলবায়ুর পরিবর্তনজনিত প্রভাবে ২০০৯ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত সময়ে বাংলাদেশের আর্থিক ক্ষতি প্রায় ১৮ হাজার ৪২৪ কোটি টাকা। প্রাকৃতিক দুর্যোগে মূলত কৃষি খাতে এ ক্ষতি হয়েছে। এর মধ্যে প্রাণিসম্পদ খাতে ৮৭৭ কোটি, পোলট্রিশিল্পে ২২২ কোটি এবং মৎস্য খাতে ক্ষতি হয়েছে এক হাজার ১০০ কোটি টাকা। স্বভাবত এরকম ক্ষতি অব্যাহত আছে এবং আর্থিক এই ক্ষতি প্রচুর কর্মসংস্থানও নষ্ট করছে।

শ্রমজীবীদের পেশাগত সংকট

ইট ও পাথরভাঙ্গা শ্রমিকদের মাঝে সিলিকোসিসের প্রাদুর্ভাব

ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সাধারণ মানুষও

বাংলাদেশের সবচেয়ে সক্রিয় শিল্প খাতের একটা হলো নির্মাণ খাত। ভবন, রাস্তা, ব্রিজ ইত্যাদিকে ঘিরে নির্মাণযজ্ঞ চলছে ব্যাপকভাবে। এই খাতের অন্যতম উপাদান ইট ও পাথর। চলমান উন্নয়ন চাহিদার যোগান দিতে দেশজুড়ে ইট-পাথর ভাঙ্গার কাজ চলে বছরের ৩৬৫ দিনই। অতীতে হাতুড়ি দিয়ে ভাঙ্গা হলেও এখন অধিকাংশ স্থানে ইট ও পাথর ভাঙ্গায় চলে এসেছে ক্রাশার মেশিনের ব্যবহার। কিন্তু এই কাজে সৃষ্ট ধুলাবালিতে সাধারণ মানুষের পাশাপাশি আক্রান্ত হচ্ছে বিশেষভাবে শ্রমিকরা– যারা সরাসরি পাথর ও ইট ভাঙ্গার কাজ করছে। শ্রম বিশেষজ্ঞদের মতে, বাংলাদেশের সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ শ্রম খাতগুলোর একটি এখন পাথর ও ইট ভাঙ্গার কাজ। ভয়ংকর সিলিকোসিস রোগে আক্রান্ত হচ্ছে এই খাতের শ্রমিকরা। কেবল ভবন নির্মানের ইট বা পাথর নয়– নানান কাজে অন্যান্য অনেক ধরনের পাথরই ভাঙ্গা হয় দেশে– শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার দিকটি উপেক্ষা করে।

বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, যেসব শ্রমিক পাথর কাটা, ভাঙা ও গুঁড়া করার কাজ করেন, তাঁরা কিছু কিছু ক্ষেত্রে সিলিকোসিসে আক্রান্ত হন। কোয়ার্টজ, গ্রানাইট, চুনাপাথরসহ বিভিন্ন পাথরে থাকা স্বচ্ছ সিলিকা শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে শ্রমিকের ফুসফুসে ঢুকে এই রোগ হচ্ছে।

বাংলাদেশে এই রোগে আক্রান্তদের একটি বড় ক্ষেত্র হলো লালমনিরহাটের পাটগ্রামের বুড়িমারি স্থলবন্দর। দৈনিক প্রথম আলো ২০১৯-এর ১ সেপ্টেম্বর এক প্রতিবেদনে জানাচ্ছে, এ পর্যন্ত সিলোকিসেসে আক্রান্ত হয়ে সেখানে ৬০ জন পাথর ভাঙার যন্ত্রের শ্রমিক মারা গেছেন। বুড়িমারি স্থলবন্দর পাথর ভাঙা শ্রমিক সুরক্ষা কমিটির সভাপতি মমিনুর রহমান সেরকমই দাবি করলেন প্রথম আলোর প্রতিবেদকের কাছে। তিনি জানিয়েছেন, এখন সিলোকোসিসে আক্রান্ত হয়ে ৫০ জন শ্রমিক গুরুতর অসুস্থ হয়ে আছেন এখনও। বুড়িমারি ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান আবু সাইদ নেওয়াজও একই ধরনের তথ্য দিয়েছেন। তবে তাঁর হিসাবে ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকের সংখ্যা আরও বেশি। তিনি জানিয়েছেন, গত ১৩ বছরে সিলিকোসিসে ৬০ জন পাথর ভাঙার শ্রমিক মারা গেছেন। বর্তমানে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ১৩০। এর মধ্যে ২০ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

২০১২ সালে বুড়িমারিতে প্রথম সিলিকোসিস রোগ নিয়ে জরিপ চালায় একটি বেসরকারি গবেষণা সংস্থা। এই সংস্থার গবেষণায় যুক্ত ক্ষয়ার হাসপাতালের রেসপিরেটরি মেডিসিন বিভাগের সহযোগী বিশেষজ্ঞ ফজলে রাব্বী মোহাম্মদ প্রচার মাধ্যমকে বলেছেন, পাটগ্রামের বুড়িমারিতে বিভিন্ন কারখানায় যে পাথর গুঁড়া করা হয়, তাতে কোয়ার্টজ ও লাইমস্টোনের পরিমাণ থাকে বেশি। এখানে ছোট ছোট আবদ্ধ ঘরে পাথর গুঁড়া করার কাজ চলছে। এতে শ্রমিকদের সারা শরীর পাথরের গুঁড়ায় সাদা হয়ে যায়। এখানে যারা কাজ করছেন, তাঁদের ফুসফুসে কম-বেশি সিলিকা যাচ্ছে সারাক্ষণ। এসব গুঁড়া যখন বেশি জমে যায়, তখন ফুসফুস তার কার্যক্ষমতা হারায়। এ কারণে শ্রমিকেরা স্বাভাবিকভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে পারেন না।

বুড়িমারি স্থলবন্দর পাথর ভাঙা শ্রমিক সুরক্ষা কমিটির সভাপতি মমিনুর রহমান গণমাধ্যমকে জানিয়েছেন, স্থলবন্দর এলাকায় ২০০১ সালে এসব পাথর ভাঙার কাজ শুরু হয়। শুরুতে ভবন বা টিনের ঘরের ভেতর চুনাপাথর ও কোয়ার্টজ ভাঙা হতো। ২০১০ সালের দিকে খোলা আকাশের নিচে এসব পাথর ভাঙা শুরু হয়। এই পাথরের গুঁড়া মাছ ও মুরগীর খাবার এবং প্রসাধনসামগ্রী, ভবন ও রাস্তা তৈরির কাজে ব্যবহার করা হয়। এসব পাথর বুড়িমারি স্থলবন্দর দিয়ে বাংলাদেশী ব্যবসায়ীরা ভুটান ও ভারত থেকে আমদানি করেন। পাটগ্রামে এখন ভবন বা টিনের ঘরে ১০টি পাথর ভাঙার কারখানা এবং খোলা আকাশের নিচে আরও প্রায় পাঁচ শ' পাথর ভাঙার যন্ত্র আছে। এখানে প্রক্রিয়াজাত করা পাথর ঢাকা, চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে পাঠানো হচ্ছে। ভাঙ্গা ও পরিবহন উভয় পর্যায়েই ধুলার বিস্তার ঘটছে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে। সঙ্গে বাড়ছে রোগাক্রান্ত মানুষও।

এই রোগের বিস্তারিত সম্পর্কে জানিয়ে শ্রমিকরা বলেছেন, প্রথমে শ্বাসকষ্টের মধ্যদিয়ে লক্ষণ ধরা পড়ে। পরে আক্রান্ত ব্যক্তি ধীরে ধীরে বেশি মাত্রায় অসুস্থ হয়ে পড়েন। কাশিতে তখন কফ হতে থাকে। ত্বকে সাদা সাদা ছোপ ছোপ দাগ সৃষ্টি হয়। চেহারায়ও বিকৃতি দেখা দেয়। মূলত পাথরের গুড়া এবং ধুলো নাকের মধ্যদিয়ে শরীরের ভেতরে প্রবেশ করেই এই রোগের বিস্তার ঘটে চলছে। দেশে ভাঙ্গা পাথরের চাহিদা যত বাড়ছে এই কাজে যুক্ত রোগাক্রান্ত মানুষের সংখ্যাও তত বাড়ছে। স্বল্প মজুরির দরিদ্র শ্রমিকরা রোগটি ধরা পড়ার পরও প্রয়োজনীয় চিকিৎসা করাতে পারেন না অর্থাভাবে এবং কাজ করে চলেন। ফলে সিলিকোসিসে আক্রান্ত শ্রমিকের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান।

সরেজমিন অনুসন্ধানে দেখা যায়, লালমনিরহাটের পাটগ্রাম থেকে বুড়িমারী স্থলবন্দর পর্যন্ত প্রায় ১৭ কিলোমিটার এলাকাজুড়ে গড়ে ওঠা পাথরভাঙা কারখানাগুলোয় সিলিকোসিসের বিস্তার ঘটে চলেছে নির্বিঘ্নে। কেবল এ এলাকাতেই পাথর ভাঙা শ্রমিক রয়েছেন প্রায় ১২ হাজার। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এখানে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে পাথর ভাঙ্গার কাজটি হচ্ছে। ভাঙ্গার প্রক্রিয়ায় পাথর থেকে প্রচুর ধুলা উৎপন্ন হচ্ছে। বাতাসে সেসব ধুলা উড়ছে। কিছু কিছু কারখানা ধুলা কমাতে পানি প্রবাহের ব্যবস্থা করলেও অনেক কারখানা সেসব অনুসরণ করছে না। এসব কারখানায় কাজের সময় পাথরের গুড়ো থেকে সিলিকা কণা নিঃশ্বাসের মাধ্যমে প্রতিনিয়ত শ্রমিকদের দেহে প্রবেশ করছে।

শ্রমিকদের পেশাগত অধিকার নিয়ে সক্রিয় বেসরকারি সংগঠন 'সেইফটি এন্ড রাইটস' দীর্ঘদিন ধরে এই রোগের বিস্তার থেকে শ্রমিকদের রক্ষার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। পাটগ্রামসহ বিভিন্ন স্থানে এই সংস্থা সিলিকোসিস সম্পর্কিত সতর্কতা ও চিকিৎসার লক্ষ্যে হেলথ ক্যাম্প করেছে। এই রোগে আহত-নিহত শ্রমিক ও শ্রমিক পরিবারদের ক্ষতিপূরণ পাওয়ার লক্ষ্যে আইনগত সহায়তাও দিয়ে যাচ্ছে সেইফটি এন্ড রাইটস। ইতোমধ্যে এই সংস্থার সহায়তায় শ্রমিকদের পক্ষ থেকে রাজশাহীর শ্রম আদালতে প্রায় ৬৫টি ক্ষতিপূরণ বিষয়ক মামলা বিচারাধীন রয়েছে। শ্রম আইনে একজন শ্রমিক এক নাগাড়ে কোন মালিকের অধীনে ছয় মাস কাজ করালেই সেই শ্রমিকদের পেশাগত ব্যাধির চিকিৎসা করানো ঐ মালিকের জন্য বাধ্যবাধকতা রূপে রয়েছে। এছাড়া চিকিৎসাকালে সংশ্লিষ্ট শ্রমিককে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত মজুরি দেয়ারও বিধান রয়েছে। কিন্তু ২০১৮ সালেও এক্ষেত্রে আইনগত বাধ্যবাধকতার পূর্ণাঙ্গ প্রতিপালন দেখা যায়নি।

লালমনিরহাটের পাশাপাশি দেশের অন্যান্য জেলার অভিজ্ঞতাও ভয়াবহ। পাথরের ধুলোবালি থেকে কেবল যে শ্রমিকরা আক্রান্ত হচ্ছেন তাই নয়–সাধারণ মানুষও আক্রান্ত। ক্ষতি হচ্ছে মানুষের শব্দ দূষণের মাধ্যমেও। বর্তমানে দেশজুড়ে নগর এলাকায় শব্দদূষণ সৃষ্টিতে ইট ও পাথর ভাঙ্গার কাজ বড় এক ভূমিকা রাখছে।

শ্রমিকদের ও সাধারণ মানুষকে ইট ও পাথর ভাঙ্গার ধুলাবালিজনিত রোগ ও শব্দ দূষণ থেকে বাঁচাতে তাই অবিলম্বে যা প্রয়োজন:

- বেআইনিভাবে চলতে থাকা সমস্ত স্টোন ক্রাশার বন্ধ করা;
- বেআইনি কারখানার মালিকদের ও তাদের মদত দিয়ে চলা সমস্ত প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ব্যক্তিদের কঠোরতম শাস্তির বন্দোবস্তো করা। ভবিষ্যতেও যাতে এই রকমের শ্রমিক খুনের কারখানা জন্মাতে না পারে তা স্থায়ীভাবে সুনিশ্চিত করা;
- দেশজুড়ে সিলিকোসিস আক্রান্ত শ্রমিকদের তালিকা রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে নথিভুক্ত করা;
- যত রকম শিল্পক্ষেত্র থেকে শ্রমিকেরা এই মরণরোগের

শিকার হন তার প্রত্যেকটিকে চিহ্নিত করে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শ্রমিকদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা;

- অবিলম্বে আক্রান্ত ও নিহত শ্রমিকদের জন্য ক্ষতিপূরণ, পুনর্বাসন, পেনশন, চিকিৎসা, পরিবারের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও খাদ্য সুরক্ষার দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে;
- অসংগঠিত ও অস্থায়ীভিত্তিতে নিযুক্ত শ্রমিকদেরও সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে;
- ক্রাশার ব্যবহৃত হয় এমন এলাকাগুলিকে 'বিপজ্জনক' হিসাবে চিহ্নিত করতে হবে এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে, আবাসিক এলাকায় পাথর ভাঙ্গার কাজ নিয়ন্ত্রণ ।;
- পাথর ভাঙ্গার বেআইনি বন্দোবস্তের সঙ্গে স্থানীয় পর্যায়ে 'ক্ষমতাবান'দের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকার কারণে বিষয়টির দেখাশোনা শেষে একটা তদন্ত প্রতিবেদন তৈরির জন্য একটি নিরপেক্ষ কমিটি গঠন করতে হবে, যার সর্বোচ্চ পদে থাকবেন হাইকোর্টের একজন বিচারপতি। সদস্য হিসাবে বিজ্ঞানী, ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী, পরিবেশবিদ, আক্রান্তদের প্রতিনিধি, সমাজকর্মী এবং সরকারের তরফে কোনও প্রশাসনিক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এই কমিটিতে থাকতে পারেন;
- পেশাগত রোগে আক্রান্ত রোগীদের জন্য সরকারি হাসপাতালে নির্দিষ্ট ওয়ার্ড, বেড ও আউটডোরে বিশেষ সুবিধার বন্দোবস্ত ককরতে হবে।

চালকল শ্রমিকদের মধ্যে বেকারত্ব বাড়ছে

অধিকাংশ মিলেই শ্রমিকদের নিয়োগপত্র কিংবা পরিচয়পত্র নেই ।

দেশজুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা রাইসমিলগুলোতে শ্রমিকদের কাজের পরিবেশে লক্ষ্যণীয় কোন উন্নতি দেখা যায়নি গত বছর । মজুরি পরিস্থিতিও ছিল আগের মতোই । পাশাপাশি বাড়ছে বেকারত্ব । বড় বড় অটো রাইসমিলগুলোর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকতে হিমশিম খাচ্ছে ছোট ছোট চালকলগুলো । ফলে সেখানে শ্রমিকদের বেকারত্ব বাড়ছে ।

এদিকে এ খাতের শ্রমিকদের পেশাগত অধিকারের স্বপক্ষে সরকারিভাবেও কোন উদ্যোগ দেখা যায়নি । এ বছরও মিলগুলোতে দুর্ঘটনার ঘটনা ঘটেছে । তবে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটেনি । ফলে হতাহতের হার কম । সাধারণত বয়লারকেন্দ্রীক দুর্ঘটনাই রাইসমিলে বেশি ঘটে ।

সংশ্লিষ্টরা বার বার বলছেন, আধুনিক চালকলের বয়লারে বিস্ফোরণের সম্ভাবনা খুব কম । বিস্ফোরণ ঘটছে সনাতন ধাঁচের রাইস মিলগুলোর বয়লারে । এসব কারখানা অনেক সময়ই রিকন্ডিশন্ড এবং স্থানীয় পদ্ধতিতে তৈরি বয়লার ব্যবহার করে থাকে । এসবের রক্ষণাবেক্ষণেও ঘাটতি থাকে, বয়লারের চাপ ও তাপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা ম্যানুয়ালি করা হয় । অনেক সময় অপারেটররা চাপ নিয়ন্ত্রণ করতে না পারায় দুর্ঘটনা ঘটে । দু'বছর আগে দিনাজপুরের চেহেলগাজি দুর্ঘটনার উদাহরণ দিয়ে সেখানকার তানজুম অটো রাইস মিলের মালিক আনিসুর রহমান বাদশা জানান, 'চালকলের বয়লারগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ ঠিকমতো না হলে বিস্ফোরণ ঘটে । বয়লারের ভেতরে জমা আয়রণ সময়মত পরিষ্কার না করা হলেও বিস্ফোরণের সম্ভাবনা থাকে । মিলের বয়লারগুলো তিন মাস অন্তর সরকারিভাবে পরিদর্শনের কথা থাকলেও সেটার বাস্তবায়ন হয় না । ফলে ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশেই কাজ করেন শ্রমিকরা । কোথাও কোথাও সেই ঝুঁকি দুর্ঘটনা ডেকে আনে ।'

বয়লার নিয়ন্ত্রণ করা সহজ কাজ নয় । এর জন্য প্রশিক্ষণ নিতে হয় । অনেক মিলে স্থায়ী ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বয়লার অপারেটর আছেন, আবার অনেক মিলে নেই । জলাধারে কতটুকু জল আছে, সেটা পরিমাপের জন্য ফানেল থাকে, বাষ্প ও তাপ নিয়ন্ত্রণে মিটার থাকা জরুরি, কিন্তু অনেক চাতাল মালিক এসব বিষয়ে অবহিত থাকেন না বা সচেতন থাকেন না । সনাতন পদ্ধতির চাতালে দেশি নিয়মে তৈরি বিশাল চুলায় বাষ্প উৎপন্ন করে ধান সেদ্ধ করা হয়, যা ঝুঁকিপূর্ণ ।

বয়লার ঝুঁকির পাশাপাশি রাইসমিল শ্রমিকরা বরাবরের মতোই এখনও মজুরি বঞ্চনারও শিকার । বিশেষ করে নারী শ্রমিকরা ।

উল্লেখ্য, দেশের চালকল শ্রমিকরা স্থায়ী ও অস্থায়ী– এই দুইভাবে নিয়োগ পান । অস্থায়ী শ্রমিকরা দিন হাজিরা চুক্তিতে কাজ করেন । চাল তৈরির প্রক্রিয়ার পর ট্রাকে তুলে দেওয়া বা গুদামে জমা করে দেওয়ার জন্য বস্তাপ্রতি মজুরি ২ টাকা । সাধারণত ১০ থেকে ১২ ঘণ্টা কাজ করতে হয় চালকলগুলোতে । সাপ্তাহিক কোনো ছুটি থাকে না । অসুস্থতা বা অন্য কোনো কারণে অনুপস্থিত থাকলে ওই দিনের মজুরি কাটা যায় । দিন হাজিরায় যারা কাজ করেন, তাঁদের দৈনিক মজুরি সর্বনিম্ন ২০০ টাকা । কিছু কিছু মিল আছে, যেখানে ঈদ বা পুজায় বেতনের সমান করে বোনাসও দেয়া হয় । আর কিছু মিলে বড় জোর একটি শাড়ি বা একটি লুঙ্গি দিয়ে বিদায় করা হয় । এসব নির্ভর করে মিলের উৎপাদন ও বিপণন ক্ষমতার ওপর । তবে অধিকাংশ মিলেই শ্রমিকদের নিয়োগপত্র কিংবা পরিচয়পত্র নেই । অথচ সংশোধিত শ্রম আইনে এ বিষয়ে স্পষ্ট উল্লেখ আছে । নারী শ্রমিকদের মাতৃত্বকালীন ছুটি নেই, অন্তঃসত্ত্বা হলে কাজ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হন তাঁরা । অধিকাংশ মিলে খাওয়া বা বিশ্রামের জন্য আলাদা সময় দেওয়া

থাকে না। শ্রমিকদের বহন করতে হয় ৫০ কেজির চালের বস্তা ও ৮৪ কেজির ধানের বস্তা। এইরূপ বোঝা দীর্ঘসময় বহন করলে শারীরিক ক্ষতির শঙ্কা থাকেই।

চালকল খাতে দুর্ঘটনাজনিত কারণে আহত বা নিহত শ্রমিক পরিবারে ক্ষতিপূরণ পাওয়ার নজির খুব কম। অনেক সময়ই রাইস মিলের মালিকপক্ষ ক্ষতিপূরণ তো দূরে থাক, ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের খবরও নেয় না।

দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগের কনসালটেন্ট আশিক ইকবাল সাপ্তাহিক একতার এস এম চন্দনের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে জানান, 'আমার কাছে কিছু রোগী আসেন যারা ভারি চালের বস্তা বহনের কারণে নানা শারীরিক সমস্যায় পড়েছেন। ক্রমাগত ভারি বস্তা বহন করলে মেরুদন্ডে চাপ পড়ে, শরীরে নানা ধরনের ব্যথার সৃষ্টি হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায়- ব্যথা তীব্র ও স্থায়ী আকার ধারণ করে। পরিণামে রোগী কর্মক্ষমতা হারায়। নারীদের ক্ষেত্রে এটা বেশি হয়। তাছাড়া চালকলে ধান প্রক্রিয়াজাত করার সময়ে যে ধূলা এবং তুষ পোড়ানো হয়– তার ফলে সৃষ্ট ধোঁয়ায় হাঁপানি হয়। হাইপার সেনসিটিভিটি নিউমোনাইটিস নামের একটি রোগও হতে পারে। এসব রোগে ফুসফুসের দীর্ঘমেয়াদী ক্ষতি হয়। দীর্ঘদিন ধুলোর মাঝে কাজ করলে ফুসফুসের ক্যান্সার হওয়ার শঙ্কাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না।'

শ্রম আইন অনুযায়ী দুর্ঘটনায় নিহত ও আহত শ্রমিকদের যে ক্ষতিপূরণ দেয়ার কথা তার কোন বাস্তবায়ন হচ্ছে না রাইসমিল খাতে। শ্রমিকরা জানান, যদি কোন ধরনের দুর্ঘটনার শঙ্কার কথা আগে থেকে মালিককে জানানো হয় এবং তার প্রেক্ষিতে ব্যবস্থা না নেয়া হয়– তাহলে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ দ্বিগুণ হওয়ার কথা। কিন্তু কার্যত দোষী মালিকরা দুর্ঘটনার পরপরই পালিয়ে যায় কিছুদিনের জন্য। তারপর বেকার শ্রমিকরা বিভিন্ন দিকে সরে যাওয়ার পর তারা আবার এলাকায় ফিরে আসে রাজনৈতিক প্রভাবশালীদের ছত্রছায়ায়।

ছোট ছোট চালকলগুলো টিকতে পারছে না

এই খাতের শ্রমিকদের মাঝে বেকারত্ব এত বেড়েছে যে, ২০১৯-এর অক্টোবরে একটা টিভি প্রতিবেদনে দেখা যায়, কেবল দিনাজপুরের ১৩টি উপজেলাতে দুই হাজার ২শ' ৫০টি চালকল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বেকার হয়ে পড়েছেন ২৫ হাজার শ্রমিক। দেশের খাদ্য ভান্ডার হিসেবে খ্যাত দিনাজপুরে কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি হচ্ছে ধান। জেলায় ছোট বড় মিলিয়ে চালকলের সংখ্যা ২ হাজার ৩শ'টি। এর মধ্যে অটো-রাইসমিল ছিল ১৮৫টি, বন্ধ হয়ে গেছে ৬৫টি। দেউলিয়া ঘোষণা শেষে বিক্রির অপেক্ষায় রয়েছে ১৬টি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বন্ধ হয়ে যাওয়া চালকলগুলোর জায়গায়

নির্মিত হচ্ছে মার্কেট কিংবা বাড়িঘর।

প্রায় একই চিত্র মিলেছে নওগাঁ থেকে। নওগাঁর খাদ্য নিয়ন্ত্রক কার্যালয় ও চালকল মালিক সমিতি সূত্রে জানা যায়, খাদ্যে উদ্বৃত্ত নওগাঁয় প্রতি বছর প্রায় ১৬ লাখ টন চাল উৎপাদন হয়। এর মধ্যে ১২ লাখ টন যায় রাজধানীসহ বিভিন্ন জেলায়। বিপুল ধান উৎপাদনের কারণে এখানে গড়ে উঠেছিল বহু চালকল। বর্তমানে ১ হাজার ২৮০টি রয়েছে। এর মধ্যে ৫৫টি অটো রাইস মিল, বাকিগুলো হাসকিং মিল। অটো রাইস মিলের আধিপত্যের কারণে হাসকিং মিলের সংখ্যা দ্রুত কমে যাচ্ছে। এরই মধ্যে ৯০০টির মতো বন্ধ হয়ে গেছে। এছাড়া হাসকিং মিলগুলো ধান কাটা-মাড়াইয়ের সময় মাত্র তিন-চার মাস চালু থাকে। এরকম মিলগুলোতেই কাজ করে এখাতের বেশির ভাগ শ্রমিক।

অন্যদিকে দৈনিক ইত্তেফাক ২০১৯-এর এপ্রিলে লিখেছে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সবচেয়ে বড়ো ধান-চালের পাইকারি মোকাম ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জ উপজেলার ৩ শতাধিক চালকল বন্ধ হয়ে গেছে। লোকসানের আশঙ্কায় বন্ধের পথে রয়েছে আরো শতাধিক। এতে বেকার হয়ে পড়েছে ১০ হাজারেরও বেশি চাতাল শ্রমিক। অগ্রিম শ্রম বিক্রি করে মালিকের কাছ থেকে দাদন নিয়ে দুর্বিসহ জীবনযাপন করছেন এসব চাতালের শ্রমিকরা।

সব জায়গাতেই চালকল ও চাতালসমূহের ব্যবসা হারানোর অন্যতম একটা কারণ অটোরাইস মিলের প্রভাব। অটোরাইস মিল প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ধান ব্যবসায়ীরা সেখানে সরাসরি ধান বিক্রি করছেন। সেকেলে আমলের রাইসমিল বা চালকলগুলি তাই আর চলছে না। কিন্তু এসব কলের শ্রমিকদের পুনর্বাসনের কোন উদ্যোগ নেই কোথাও।

অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত

রিকসা বন্ধের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের আন্দোলন

নগর প্রশাসনের সিদ্ধান্তে নিম্নবিত্তের অর্থনীতিতে সংকট

২০১৯ সালে ঢাকায় বিভিন্ন সড়কে নতুন করে রিকসা চলাচল বন্ধের উদ্যোগ নেয়া হয়। এতে মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্তের প্রতিদিনকার কাজে গমনাগমনে ব্যাপক সংকট তৈরি হয়। অনেক এলাকাতেই শিশু-কিশোররা স্কুলে যেতে সমস্যায় পড়ে। রিকসার অভাবে অনেক স্থানে বয়োবৃদ্ধরা হাসপাতালে যেতে পারছিলেন না। পাশাপাশি রিকসাচালকরা ব্যাপকভাবে আয়রোজগারের সংকটে পড়ে নগর প্রশাসনের এই সিদ্ধান্তে।

ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মোহাম্মদ সাঈদ খোকন এই সিদ্ধান্তের আনুষ্ঠানিক উদ্যোক্তা এবং ঘোষণাকারী। ঢাকার অপর মেয়রও এই উদ্যোগের একজন সক্রিয় সহযোগী ছিলেন।

যেসব রুটে রিকসা চলাচল বন্ধ করার উদ্যোগ নেয়া হয় তার মধ্যে আছে গাবতলী থেকে আজিমপুর, সায়েন্স ল্যাব থেকে শাহবাগ, কুড়িল থেকে খিলগাঁও হয়ে সায়েদাবাদ। তিনটি রুট হলেও কার্যত এই সিদ্ধান্তে ঢাকার বিশাল অংশের মানুষের জন্য চরম ভোগান্তি তৈরি হয়। কারণ এসব সড়কের উপর দিয়েই বিভিন্ন ক্রসিং। ৭ জুলাই থেকে এই নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করার ঘোষণা দেয়া হয়। কোন বিকল্প ব্যবস্থা না করেই এই সিদ্ধান্ত হয় বলে অভিযোগ ছিল সাধারণ মানুষের।

ঢাকার প্রধান প্রধান সড়কগুলো বর্তমানে প্রাইভেট কারে পরিপূর্ণ হলেও মেয়র সাঈদ খোকন সাংবাদিকদের কাছে দাবি করেছেন 'ঢাকায় যানজটের প্রধান কারণ ধীরগতির রিকসা।' তিনি কর্মচ্যুত রিকসাচালকদের 'গ্রামে যেয়ে ধান কাটা'র জন্য বলেন।

মেয়রের এই একতরফা সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে রিকসাচালকরা কয়েকদিন ধরে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন চালান। নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়ার দাবিতে তারা বিভিন্ন সড়কে অহিংস অবস্থান কর্মসূচিতে অংশ নেন। রিক্সাযাত্রী সাধারণ মানুষও এসব কর্মসূচিতে সমর্থন জানান।

মেয়রের সিদ্ধান্তে আঘাতপ্রাপ্ত নিম্নবিত্তের অর্থনীতি

যদিও ঢাকায় রিকসার লাইসেন্স দেয়া বন্ধ–কিন্তু 'বিলস্' নামে পরিচিত শ্রম বিষয়ক এক সংস্থার অনুসন্ধানে জানা যায়, বৈধ ও অবৈধ মিলে রাজধানীতে কয়েক লাখ রিকসা-ভ্যান চলাচল করছে। এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন নিয়মিত-অনিয়মিত পাঁচ লাখের অধিক চালক– যদিও সকলেই প্রতিদিন রিকসা চালান না।

চালকদের বাইরে রিকসাশিল্পের সাথে কেবল ঢাকা মহানগরীতে আনুমানিক কয়েক লাখ মানুষ কম-বেশি যুক্ত। এর সাথে জড়িত আছে রিকসার বডি মিস্ত্রী, হুড মিস্ত্রী, রেসকিং কোম্পানী, হ্যান্ডেল কোম্পানী, চ্যাসিস কোম্পানী, স্প্রিং কোম্পানী, এক্সেল কোম্পানী, বিয়ারিং কোম্পানী, টায়ার কোম্পানী, টিউব, রিং, গিয়ার, চেইন তৈয়ারকারীসহ বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠান। এর বাইরে ঢাকার ছোট ছোট বাড়িওয়ালা, মুদি দোকান, চা দোকান, গ্যারেজ মালিকসহ অনেকে রিকসা অর্থনীতির সঙ্গে লেপটে আছে। প্রতিদিন যদি ৩ লাখ রিকসা চালক কম বেশী প্রায় ৫০০ টাকা হারে আয় করে, তাহলে তার পরিমান দাঁড়ায় ১৫ কোটি। ৩ লাখ রিকসার বিপরীতে মালিকরা দৈনিক ১০০ টাকা হারে হলেও অন্তত ৩ কোটি টাকা জমা পায়। বছরে পাঁচ হাজার কোটি টাকার এই পুরো অর্থের বিরাট অংশই যায় গ্রামীণ অর্থনীতিতে। কারণ রিকসা শ্রমিক ও মালিকদের অনেকের পরিবার পরিজনই থাকে গ্রামে।

পূর্বাপর না ভাবা নীতিনির্ধারকদের নিষেধাজ্ঞায় নিম্নবিত্ত মানুষের এই বিশাল অর্থনীতি উচ্ছেদ আতংকে স্থায়ীভাবেই হুমকির মুখে থাকে। ইতিপূর্বে অনুরূপ এক সিদ্ধান্তে নিম্নবিত্তদের চলাচলের অন্যতম বাহন লেগুনা বন্ধ করা হয় রাজধানীর বিভিন্ন রুটে। অথচ রিকসা ও লেগুনার প্রসার ঘটছিল জনচাহিদার কারণেই। অনেক শহরে হয়রানি করা হয় ব্যাটারিচালিত রিক্সাকে। বিকল্প জনপরিবহন ব্যবস্থা না করে এসব তুলে দেয়ার ভাবনা নগর জীবনে বিশৃংখলা বাড়ায়।

ঢাকার যানজটের প্রধান কারণ প্রাইভেট গাড়ি; কিন্তু আক্রান্ত রিকসা

এক গবেষণায় দেখা গেছে, ঢাকার রাস্তায় আড়াই লাখ ব্যক্তিগত গাড়ী চলাচল করে। প্রাইভেট কারগুলো ঢাকার রাস্তার ৭৬ শতাংশ জায়গা দখল করে রাখলেও প্রতিদিনকার যাত্রীদের মাত্র ৬ শতাংশ এর সুবিধাভোগী। অথচ রিকসায় চলাচল করে প্রায় ৬০ ভাগ নগরবাসী। স্পষ্ট যে, নগর

প্রশাসনের রিকসাবন্ধের সিদ্ধান্তের উপকারভোগী সমাজের গুটিকয়েক ব্যক্তি এবং তাতে বিপদগ্রস্ত সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ। মেয়রের সিদ্ধান্তে যদিও তাৎক্ষণিকভাবে প্রতীয়মান হয়, রিকসা বন্ধ হলে ঢাকা যানজট মুক্ত হবে– কার্যত তা ঘটেনি। অতীতে যেসব সড়কে যানজট মুক্ত করার নামে রিকসা বন্ধ করা হয়েছে সেখানেও গত বছর একই অবস্থা বিরাজ করছিল। অতীতের চেয়ে প্রায় সর্বত্র যানজট আরও বেড়েছে। এর কারণ অনুসন্ধান করতে যেয়ে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা দেখেছেন, রাজধানীতে বর্তমানে গাড়ি রয়েছে সাড়ে ১৩ লাখ। এর মধ্যে ব্যক্তিগত গাড়ির সংখ্যা সাড়ে ১০ লাখ। ঢাকার রাস্তায় প্রতিদিন যোগ হচ্ছে ২৫০ গাড়ি, অর্থাৎ বছরে ৯০ হাজার। এর মধ্যে ৭০ হাজারই ব্যক্তিগত গাড়ি। ফলে ঢাকায় প্রতিদিনই বাড়ছে গাড়ির চাপ, বাড়ছে যানজট।

নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনাবিদ অধ্যাপক ড. সারওয়ার জাহান বলেন, যানজট দূর করার জন্য ব্যক্তিগত গাড়ি নিয়ন্ত্রণ জরুরি। প্রাইভেট গাড়ির ব্যবহার নিরুৎসাহী করতে হবে এবং যানজট নিরসনে শহরের রাস্তাগুলো দখলমুক্ত করতে হবে।

লাখ লাখ মানুষের অর্থনীতিঃ নেই তার সামাজিক কোন সুরক্ষা ও স্বীকৃতি

বিলস্ রিকশা বিষয়ে তাদের গবেষণার ফল প্রকাশ করে এও জানিয়েছিল যে, অতিরিক্ত দূষিত পরিবেশে কাজ করা, অধিক পরিশ্রম এবং অল্প আয়ের কারণে ঢাকার ৯৪ শতাংশই রিকশাচালক প্রায়ই অসুস্থ থাকেন। বিশেষ করে জ্বর-কাশি, ঠান্ডা, গায়ে ব্যথা, দুর্বলতা লেগেই থাকে। সেইসঙ্গে তাঁরা ৩০ শতাংশ জন্ডিসে আক্রান্ত বলে জরিপে উঠে এসেছে।

সংস্থাটির কর্মকর্তা কোহিনূর মাহমুদ জানিয়েছেন, পূর্ববর্তী বছরের চেয়ে আয় রোজগার বাড়লেও রিকসা চালকদের জীবনমানের কোন উন্নতি হয়নি। মাঝে মাঝেই তাদের চালনা বাদ দিতে হয়। কারণ কাজটি খুবই শ্রমসাধ্য এবং রোদ-বৃষ্টিতে পুড়তে হয়। রিকসা চালনাকালে তাঁদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রারও সুযোগ থাকে না। বিশেষ করে বিশ্রাম, খাবার দাবার, বিশুদ্ধ পানি ও টয়লেটের সংকটে ভুগতে হয় প্রকটভাবে। বেশিরভাগ সময় ড্রেনে বা গাছপালার আড়ালে টয়লেটের কাজ সারতে হয়। এছাড়া যে কয়টা মোবাইল টয়লেট বা পাবলিক টয়লেট রয়েছে, সেগুলো ব্যবহারের ক্ষেত্রেও ৫ থেকে ১০ টাকা গুনতে হয়। আছে সেগুলোর সামনে গাড়ি রাখার ঝামেলা। বেশিরভাগ রিকশাওয়ালা তাদের দিনের খাওয়া সারেন বিভিন্ন টঙের দোকানে রুটি, কেক ও চা খেয়ে। এভাবে তাঁরা ভাত খাওয়ার পয়সা সাশ্রয় করতে চেষ্টা করেন। সব মিলিয়ে রিকশা চালকরা বড় ধরনের স্বাস্থ্যঝুঁকিতে আছেন বলে বিলসের গবেষণায় উঠে এসেছে।

চালকদের স্বাস্থ্যঝুঁকির পেছনে রিকসার কাঠামোও একটা সমস্যা। অধিকাংশ রিকসা একই কাঠামোগত মাপে তৈরি। কিন্তু যে চালক লম্বা তাকে রিকশাটা নুয়ে চালাতে হয়। যিনি খাটো, তাদের দাঁড়িয়ে চালাতে হয়। আবার যারা শারীরিক প্রতিবন্ধী, তারাও রিকশা চালান। কিন্তু রিকশাটা তাদের অনুযায়ী আরামদায়ক করে তৈরি হয় না। যার কারণে কিছুদিন পরই তাঁরা স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে পড়েন। এভাবে অনেক শ্রমিকের কাজ করার ক্ষমতা আগের চাইতে কমে যায়। অথচ এই বিষয়গুলো সমাজে কখনোই আলোচনার বিষয় হয়ে উঠে না। ২০১৯-এর রিক্সা শ্রমিকদের সাথে ইতিবাচক কোন পদক্ষেপ বা কর্মসূচির কথা শোনা যায়নি।

সরাসরি আলাপচারিতায় রিকসা চালকরা অনেকেই পুলিশ ও যাত্রীদের তরফ থেকে অশোভন আচরণের অভিযোগও করেছেন। প্রায় ৯৪ ভাগ রিকসা চালক জানিয়েছেন, যাত্রীরা তাদের তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেন। রিকসায় করে যাতায়াত যে একটা দ্বিপাক্ষিক চুক্তি এবং যাত্রীর মতোই চালকও যে এই চুক্তির একটা পক্ষ– অনেক যাত্রীই সে বিষয়ে সচেতন নয়। ৫৩ ভাগ রিকসা চালক এও জানিয়েছেন, যাত্রীরা অনেক সময় ভাড়ার জন্য অপেক্ষায় রেখে ভাড়া না দিয়ে পালিয়ে যান।

পরিবহন খাত

নতুন সড়ক আইনের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের প্রতিবাদ অব্যাহত

বাংলাদেশের শ্রমিক অঙ্গনের একটা উত্তপ্ত ক্ষেত্র ছিল ২০১৯ সালে পরিবহন খাত। এই খাতের শ্রমিকরা সড়ক পরিবহন আইন সংশোধন করা ও কার্যকর না করার দাবিতে এ বছর অনেক ধরনের কর্মসূচি পালন করেছে। বিশেষ করে এ সময় দেশের বিভিন্ন স্থানে এবং জাতীয়ভাবেও সহিংস ধর্মঘট পালন করে পরিবহন শ্রমিকরা। এসব ধর্মঘটকালে ধর্মঘট এড়িয়ে কাজে যাওয়ার পথে যাত্রীদের নাজেহাল করার ঘটনাও ঘটেছে। হয়েছে অনেক গাড়ি ভাঙ্গচুর। তবে এসব প্রতিবাদের মাঝেই আলোচ্য আইনটি ২০১৯-এর নভেম্বর থেকে কার্যকর হয়ে গেছে।

পূর্ববর্তী বছর সড়ক নিরাপত্তার দাবিতে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের কারণে সরকার এই আইন তৈরি করেছে বলে সাধারণভাবে মনে করা হয়। এতে দুর্ঘটনার দায়ে চালকের শাস্তি ও জরিমানা বৃদ্ধি করা হয়েছে। আইনটি বাস্তবায়ন হলে সড়কে কিছুটা শৃঙ্খলা ফিরে আসবে বলে সরকার দাবি করেছে। সড়ক নিরাপত্তা লঙ্ঘনকারীদের শাস্তি ও জরিমানা বাড়ায় সতর্কতা বাড়বে বলে অনুমান করা হচ্ছে। কিন্তু পরিবহন শ্রমিকরা প্রথম থেকেই এই আইনের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে আছে। তারা মূলত আইনে শাস্তির যে বিধান রয়েছে তাকে আরও নমনীয় করা এবং অর্থদন্ড হ্রাস ও ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়ার শর্ত শিথিলের দাবি জানাচ্ছে। তবে এর বাইরেও তাদের আরও অন্তত ৫টি আপত্তি রয়েছে আইনটির বিরুদ্ধে। এসব আপত্তি মানতে হলে কার্যত নতুন আইনের আর কোন বিশেষ কার্যকারিতাই থাকে না। তবে শ্রমিকরা বলছেন, 'সড়ক দুর্ঘটনার মামলা যদি জামিন অযোগ্য হয়, তাহলে পরিবহন শ্রমিকদের পক্ষে গাড়ি পরিচালনা করাই সম্ভব হবে না।'

নিরাপদ সড়কের দাবিতে সোচ্চার বাংলাদেশ যাত্রী কল্যাণ সমিতির হিসাব অনুযায়ী, ২০১৮ সালে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রায় ৭ হাজার মানুষ মারা গেছে। পুলিশের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে সড়ক দুর্ঘটনার গবেষণা করে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের সড়ক দুর্ঘটনা গবেষণা ইনস্টিটিউট (এআরআই)। তাদের তথ্য বলছে, দেশে ৫৩ শতাংশ সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে অতিরিক্ত গতির জন্য। আর চালকদের বেপরোয়া মনোভাবের কারণে দুর্ঘটনা ঘটে ৩৭ শতাংশ। অর্থাৎ চালকের বেপরোয়া মনোভাব ও গতির কারণে ৯০ শতাংশ দুর্ঘটনা ঘটছে। এ জন্য দুর্ঘটনায় দায়ী চালকের শাস্তি বৃদ্ধির দাবি করে আসছিল সড়ক নিরাপত্তার জন্য সোচ্চার সংগঠনগুলো। এ বিষয়ে এক ধরনের সামাজিক ঐক্যমতও রয়েছে। তবে সড়ক খাতের প্রভাবশালী সংগঠনগুলো রাজনৈতিকভাবে খুবই শক্তিশালী। যে কারনে এখাতে 'অপরাধী' কারো শাস্তির নজির খুব কম এবং কঠোর আইন করেই কেবল শাস্তির হার বাড়ানো যাবে কি না তা প্রশ্ন সাপেক্ষ হয়ে আছে।

নতুন সড়ক পরিবহন আইনে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণহানির জন্য ৯৮ ও ১০৫ ধারায় শাস্তির বিধান আছে। ১০৫ ধারায় চালকের সর্বোচ্চ পাঁচ বছর সাজা হবে বলে উল্লেখ রয়েছে এবং যা বিদ্যমান দন্ডবিধি অনুসারে বিচার হবে বলে বলা হয়েছে। এই ধারায় সর্বোচ্চ পাঁচ লাখ টাকা জরিমানা বা উভয় দন্ডে দন্ডিত করার বিধানও রয়েছে। আর ৯৮ ধারায় সর্বোচ্চ সাজা তিন বছরের কারাদন্ডের বিধান রাখা হয়েছে। এর বিচার হবে মোটরযান আইনে। এতে সর্বোচ্চ তিন লাখ টাকা জরিমানা বা উভয় দন্ডের বিধান রাখা আছে। জরিমানার একটি অংশ বা পুরোটা দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তকে দিতে পারেন আদালত। আইনে এই দুটি ধারা জামিন অযোগ্য।

২০১৯-এর ১২ জুন সরকারের সঙ্গে এক বৈঠকে উপরোক্ত আইনে সাজা কমানোর বিষয়ে সুনির্দিষ্ট দাবি তুলেছিলেন পরিবহন মালিক ও শ্রমিকনেতারা। বৈঠকে উপস্থিত সূত্র জানায়, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের কার্যকরী সভাপতি ও সাবেক নৌপরিবহনমন্ত্রী শাজাহান

খান ৯৮ ও ১০৫ ধারায় সাজা কমানো এবং এই দুটি ধারার অপরাধকে জামিনযোগ্য করার দাবি করেন। নতুন সড়ক পরিবহন আইনে চালকের লাইসেন্স পেতে সর্বনিম্ন শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি করা হয়েছে। কোনো ব্যক্তি নকল, ভুয়া ও জাল লাইসেন্স ব্যবহার করলে সর্বোচ্চ দুই বছরের কারাদন্ড এবং পাঁচ লাখ টাকা পর্যন্ত জরিমানার বিধান আছে। শাজাহান খান শিক্ষাগত যোগ্যতার বিষয়টি তুলে দেওয়ার এবং জাল লাইসেন্সের দন্ড কমানোর দাবি করেন। বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন সমিতির সভাপতি মসিউর রহমান ও সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক ওসমান আলীও আইনের বেশ কয়েকটি ধারা পরিবর্তনের দাবি তোলেন।

এসব দাবির পরিপ্রেক্ষিতে বৈঠকে ৯৮ ও ১০৫ ধারার অধীনে যে অপরাধের কথা বলা হয়েছে, সেই অপরাধে ভারত, মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুরে কী ধরনের দন্ডের বিধান রয়েছে, তা খতিয়ে দেখে সড়ক পরিবহন মন্ত্রণালয়কে মতামত দিতে বলা হয়েছে। এ ছাড়া ৯৮ ধারাটি ভেঙে ভিন্ন ভিন্ন ধারায় অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়েও মন্ত্রণালয়কে দায়িত্ব দেওয়া হয়।

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় সূত্র জানিয়েছে, মন্ত্রণালয় মালিক-শ্রমিক সংগঠনের দাবি অনুসারে আইনের কোন কোন ধারায় পরিবর্তন আনা যায়, এই বিষয়ে একটি প্রস্তাব তৈরির কাজ করছে। ৯৮ ধারাকে ভেঙে দুটি ধারায় আনার প্রস্তাব দেয়া হতে পারে। এতে করে সাজাও কমে যাবে। অপরাধটি জামিনযোগ্য করার বিবেচনাও তাদের আছে। আর ১০৫ ধারায় সাজা পাঁচ বছর থেকে কমিয়ে তিন বছর করার বিষয়ে সরাসরি কোনো প্রস্তাব করবে না মন্ত্রণালয়। তবে এই ধারার সাজা জামিনযোগ্য করার প্রস্তাব করবে তারা। এসব সংশোধনের পূর্বেই অবশ্য আইনটি কার্যকর করা হয়েছে এবং সম্ভাব্য সংশোধনগুলো হয়তো ভবিষ্যতে করা হবে।

সড়ক পরিবহন আইন ও এর সংশোধন দাবি বিষয়ে আইনমন্ত্রী আনিসুল হক ২০১৯-এর শেষ পর্যায়ে সাংবাদিকদের বলেছেন, তাঁদের কমিটির কাজ শেষ পর্যায়ে। শিগগির তাঁদের সুপারিশ চূড়ান্ত হবে। মালিক-শ্রমিকনেতাদের দাবি সম্পর্কে আইনমন্ত্রী বলেন, মালিক-শ্রমিকদের যেকোনো দাবি করার অধিকার আছে। তবে যুক্তিসংগত দাবিই বিবেচনা করা হবে।

সড়ক পরিবহন মন্ত্রণালয় সূত্র বলছে, বর্তমানে মালিক-শ্রমিক সংগঠনগুলো পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করছে সরকারদলীয় বিভিন্ন পর্যায়ের নেতারা। ফলে নতুন সড়ক আইন সংশোধন করার জন্য সরকারি দলের অভ্যন্তরেই চাপ রয়েছে।

এদিকে, নতুন সড়ক আইন কার্যকর হলেও গত বছরও এই খাতের চাঁদাবাজি ব্যাপকভাবে অব্যাহত ছিল। দৈনিক প্রথম আলোর অনুসন্ধানে জানা গেছে, পরিবহন খাতে বছরে হাজার

কোটি টাকার বেশি চাঁদাবাজি হয়।

পাশাপাশি, ৯ নভেম্বর এই একই দৈনিক লিখেছে, 'পূর্বপ্রস্তুতি ছাড়া নতুন সড়ক পরিবহন আইন কার্যকর করতে গিয়ে বেকায়দায় পড়েছে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ)। নতুন আইনে মোটরযানের নিবন্ধন, চালকের লাইসেন্স পরীক্ষার পদ্ধতি, মোটরযানের ফিটনেস সনদের মেয়াদ, গণপরিবহনের চলাচলের অনুমতির (রুট পারমিট) বিষয়গুলো স্পষ্ট নয়। বিধিমালার মাধ্যমে এগুলো পরিষ্কার করার সুযোগ থাকলেও তা এখনো প্রণয়ন করা হয়নি। নতুন আইন ও পুরানো বিধিমালা অনুসারে সর্বশেষ বিআরটিএ দৈনন্দিন কাজকর্ম চালাচ্ছিলো।

বিআরটিএর পর সড়ক আইন কার্যকরে বড় ভূমিকা পুলিশের। কিন্তু তাদের মামলা করার যন্ত্রের সফটওয়্যার হালনাগাদ করা হয়নি। এ কারণে সড়কে আইন অমান্যের জন্য তারা জরিমানা ও মামলা করতে পারছিল না।

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় সূত্র জানিয়েছে, মন্ত্রণালয় মালিক-শ্রমিক সংগঠনের দাবি অনুসারে আইনের কোন কোন ধারায় পরিবর্তন আনা যায়, এই বিষয়ে একটি প্রস্তাব তৈরির কাজ করছে।

জাহাজ ভাঙ্গা

শিল্পের পরিসর বাড়ছে; শ্রমিক সুরক্ষার অবস্থা আগের মতোই

জাহাজ ভাঙ্গায় বাংলাদেশ গত বছর প্রথম স্থান অর্জন করে নিয়েছে। পরিবেশগত উদ্বেগের কারণে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ যখন জাহাজ ভাঙ্গার কাজ কমিয়ে দিচ্ছে– বাংলাদেশ তখন ঐ কাজের প্রধান ভূমি হয়ে উঠেছে।

জাতিসংঘের উন্নয়ন ও বাণিজ্য সংস্থা 'আঙ্কটাড' প্রকাশিত 'রিভিউ অব মেরিটাইম ট্রান্সপোর্ট ২০১৯' শীর্ষক প্রকাশনায় উপরোক্ত অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে। ২০১৯-এর ৩০ অক্টোবর প্রতিবেদনটি প্রকাশ হয়। প্রতিবেদনে বিশ্বজুড়ে সমুদ্রপথে পণ্য পরিবহন, জাহাজ নির্মাণ, মালিকানা ও নিবন্ধন এবং সমুদ্র যোগাযোগে দেশগুলোর অবস্থান নিয়ে তথ্য তুলে ধরা হয়।

অন্যদিকে গ্লোবাল কোয়ালিশান নামের সংস্থা জানিয়েছে বাতিল জাহাজের সবচেয়ে বড় গন্তব্য এখন বাংলাদেশ। ২০১৯-এর প্রথমার্ধে বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক এ ধরনের জাহাজ এসেছে। এই সময়টাকে পুরো বিশ্বে জাহাজ ভাঙ্গা হয়েছে ৩৭৪টি এবং এর মধ্যে ১৫৬টি ভাঙ্গা হয়েছে বাংলাদেশে। ২০১৯ সালে বাংলাদেশে জাহাজ ভাঙ্গার কাজ ৬৭.৭৮ শতাংশ বেড়ে গেছে।

২০১৮ সালের পরিসংখ্যানে দেখা যায়, বিশ্বে যত জাহাজ ভাঙা হয়েছে, তার ৪৭ দশমিক ২ শতাংশ বাংলাদেশে ভাঙা হয়েছে। ২০১৮ সালে এখানে জাহাজ ভাঙ্গা হয়েছিল ৯৩টি।

কাস্টমসের তথ্যে দেখা যায়, ২০১৮ সালে বাংলাদেশে ১৯৬টি জাহাজ ভাঙার জন্য আমদানি হয়। এসব জাহাজ থেকে পাওয়ার কথা ২৫ লাখ ৮১ হাজার টন লোহা। এ জন্য ১ দশমিক ১১ বিলিয়ন ডলার বা প্রায় সাড়ে নয় হাজার কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা গুনতে হয়েছে।

পরিবেশবাদীরা এবং চিকিৎসকরা বহুদিন থেকে বলছেন, জাহাজ ভাঙ্গার 'শিল্প' মানুষের স্বাস্থ্য ও পরিবেশ উভয়েরই অপূরণীয় ক্ষতি করছে।

জাহাজ ভাঙায় বাংলাদেশের পরের অবস্থান ভারতের। ২০১৮ সালে বাংলাদেশ ৮৬ লাখ টন আয়তনের জাহাজ ভেঙেছে। ভারতে ভাঙা হয়েছে ৪৬ লাখ ৯০ হাজার টন আয়তনের জাহাজ। এরপরের অবস্থান যথাক্রমে পাকিস্তান, তুরস্ক ও চীনের। ২০১৭ সালে জাহাজ ভাঙায় শীর্ষস্থানে ছিল ভারত।

বেসরকারি সংস্থা শিপব্রেকিং প্ল্যাটফর্ম (এনএসপি) আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর একটা– যারা জাহাজ ভাঙ্গার কারণে সৃষ্ট পরিবেশগত ক্ষতির বিষয়টি কমিয়ে আনার জন্য কাজ করছে। সেই সাথে পুরো বিশ্ব জুড়েই যাতে জাহাজ ভাঙ্গার কাজটি পরিবেশকে রক্ষা করে করা হয়, সেজন্য চেষ্টা করছে তারা। বাংলাদেশের জাহাজ ভাঙ্গার প্রক্রিয়াকে 'নোংরা ও বিপজ্জনক' আখ্যা দিয়ে এনএসপি বলেছে, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিবেশ ও শ্রম আইনের দুর্বল প্রয়োগের কারণে এখানে পরিবেশ, কর্মী ও স্থানীয় মানুষের অপূরণীয় ক্ষতি হচ্ছে। তারা জানিয়েছে, জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত তিনজন কর্মী জাহাজ ভাঙ্গার সময় প্রাণ হারিয়েছে এবং আরও চারজন মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে।

পরিবেশবাদী গ্রুপটি বাংলাদেশের কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে যাতে দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্য 'বাংলাদেশ শিপ রিসাইক্লিং অ্যাক্ট, ২০১৮' যথাযথভাবে অনুসরণ করে।

এদিকে, জাহাজ ভাঙায় শীর্ষে থাকলেও জাহাজ নির্মাণে বাংলাদেশের অবস্থান নিচের সারিতে। চীন, দক্ষিণ কোরিয়া ও জাপান জাহাজ নির্মাণে নেতৃত্ব দিচ্ছে। গত বছর এই তিনটি দেশ বিশ্বের ৯০ শতাংশ জাহাজ নির্মাণ করেছে। বাংলাদেশ করেছে দশমিক শূন্য ৪ শতাংশ।

অন্যদিকে ২০১৯-এর ১৯ মে এই খাতের শ্রমিকদের নিরাপদ

কর্ম পরিবেশের দাবিতে চট্টগ্রামে এক মানববন্ধনে মিলিত হয় জাহাজ-ভাঙ্গা শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন ফোরাম। মানববন্ধনকালে এই সংগঠনের নেতৃবৃন্দ দাবি করেন যে, ২০১৪ সাল থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত ৫ বছরে শিপব্রেকিং ইয়ার্ডে ৭৭ জন শ্রমিকের মৃত্যু হয়। এছাড়া ২০১৯-এর প্রথম চার মাসে ৬ শ্রমিকের মৃত্যু ও ১৬ জন আহত হয়েছে। উল্লেখ্য, মানববন্ধনের চার দিন আগে ১৫ মে সীতাকুন্ডে প্রিমিয়াম ট্রেড করপোরেশন নামে একটি কারখানায় জাহাজ কাটার সময় আগুন লেগে ২ শ্রমিক নিহত ও ৫ জন শ্রমিক মারাত্মকভাবে আহত হন।

৩১ জুলাই সীতাকুন্ডের শীতলপুরে ম্যাক কর্পোরেশন নামে একটি পুরাতন জাহাজ ভাঙ্গার ইয়ার্ডে আরেক দুর্ঘটনায় বিষাক্ত গ্যাসে আক্রান্ত হয়ে তিন শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে।

১৯ মে'র মানববন্ধনে শ্রমিকরা বলেন, জাহাজ ভাঙ্গা কারখানার মালিকরা মুনাফা ছাড়া কিছুই বোঝে না। মালিকের অতি মুনাফার বলি হচ্ছে শ্রমিকরা। এসব কারখানায় শ্রমিকদের মৃত্যু কোনোভাবেই নিছক মৃত্যু নয়। বছরের পর বছর ধরে কর্মক্ষেত্রকে অনিরাপদ রেখে শ্রমিকদের হত্যা করা হচ্ছে বলে তাঁরা দাবি করেন।

নিহতদের পরিবারকে কমপক্ষে ১০ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবি জানিয়ে বক্তারা বলেন, রুটি-রুজির জন্য এসে শ্রমিকের জীবনই যদি হুমকির মধ্যে পড়ে, তাহলে সেটা কখনোই শিল্পের ভবিষ্যতের জন্য সুখকর হতে পারে না। বরং পুরো শিল্পই এখন হুমকির মধ্যে আছে বলা যায়। মানববন্ধনে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জাহাজ-ভাঙ্গা শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন ফোরামের যুগ্ম আহ্বায়ক শ্রমিক দলের চট্টগ্রাম বিভাগীয় সভাপতি এ এম নাজিম উদ্দিন ও সাধারণ সম্পাদক শেখ নূরুল্লাহ বাহার, আব্দুর রহিম মাষ্টার, মোহাম্মদ আলী, পাহাড়ি ভট্টাচার্য এবং ফজলুল কবির মিন্টু।

এদিকে দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন গত সেপ্টেম্বরে তাদের এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, ২০১৯-এর প্রথম আট মাসে সিতাকুন্ডের জাহাজভাঙ্গা শিল্পে ১৬ জন শ্রমিক বিভিন্ন দুর্ঘটনায় মারা গেছে। এই তথ্য দিয়ে ১১ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবে এই খাতের শ্রমিকদের পক্ষ থেকে জাহাজ-ভাঙ্গা শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন ফোরাম ১০ দফা দাবি তুলে ধরে।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয় 'চট্টগ্রামের সীতাকুন্ডে বঙ্গোপসাগর উপকূলে ১৫০টির বেশি শিপ ব্রেকিং ইয়ার্ডের নিবন্ধন আছে। কিন্তু কাজ চলছে ৫০-৬০টি ইয়ার্ডে। এসব কারখানায় সরাসরি কাজ করে প্রায় ২৫ হাজার শ্রমিক। পরোক্ষভাবে প্রায় ৬০ হাজার শ্রমিক এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত।'

সম্মেলনে দাবি করা হয়, 'শ্রম আইন অনুযায়ী কর্মস্থলে নিহত শ্রমিকের পরিবারকে ২ লাখ টাকা এবং জেলা প্রশাসকের গঠিত ক্রাইসিস কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আরও ৫ লাখ টাকা দেওয়ার কথা থাকলেও তা মানা হচ্ছে না।'

তবে নির্ভরযোগ্য একটা সূত্রে জানা যায় যে, কল্যাণ তহবিল থেকে ১৯ জন নিহত শ্রমিকের পরিবারকে সুনির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দেয়া হয়েছে।

চা শিল্প

ভূমিহীন হওয়ায় শোষণমূলক শর্তেও বাগানে পড়ে থাকতে হয় শ্রমিকদের; উৎপাদনে রেকর্ড কিন্তু মজুরি সামান্য

চা উৎপাদনের ১৬৫ বছরের ইতিহাসে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ উৎপাদনের রেকর্ড গড়েছে বাংলাদেশ ২০১৮ সালে। সেবছর উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৭ কোটি ২৩ লাখ কেজি। আর উৎপাদিত হয়েছে ৮ কোটি ২০ লাখ কেজি। যা লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ৯৭ লাখ কেজি বেশি। ২০১৯ সালেও লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশি উৎপাদিত হয়েছে চা। কিন্তু প্রত্যাশার চেয়ে বেশি উৎপাদন হলেও বদলাচ্ছে না চা শ্রমিকদের জীবন ও আর্থিক অবস্থা। মজুরি তাদের সেভাবে বাড়ছে না।

বর্তমানে সারাদিন কাজের পর একজন চা শ্রমিকের আয় ১০২ টাকা, এর সঙ্গে আছে সামান্য মাত্র কিছু রেশন। এর বাইরে নেই নিজস্ব নৃতাত্ত্বিক জাতিগত পরিচয় রক্ষার কোন উপায়, নেই উচ্চতর লেখাপড়ার কোন ব্যবস্থা, নেই বিশুদ্ধ পানি ও স্যানিটেশনের ব্যবস্থা। রয়েছে চিকিৎসার অভাবও। কাজ করতে গিয়ে অঙ্গহানি ঘটলেও কোনো সাহায্য নেই। নিজের অধিকার নিয়ে সবাই যেনো সোচ্চার না হয়ে পড়ে– সেজন্য কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় নেশার ঘোরে রাখার ব্যবস্থা আছে শ্রমিকদের। পরিকল্পিতভাবে প্রতিটি চা বাগানে রয়েছে মদের দোকান। উপরন্তু এমন একটি শ্রমিক ইউনিয়ন আছে– মালিকরা যা চায় সেটাই অনেকাংশে মেনে নেয় তারা। সরকারও এই মালিকদের সিদ্ধান্তে কোনদিন হস্তক্ষেপ করেছে বলে জানা যায় না।

সবমিলে হতভাগ্য এক জনগোষ্ঠী চা শ্রমিকরা। ব্রিটিশ শাসনামলে সুন্দর জীবনযাত্রার লোভে পড়ে এদেশে আসার পর থেকে তাদের কপালে জুটেছে শুধু অবহেলা-নির্যাতন-বঞ্চনা। এরা যেনো আজকের দিনের আধুনিক ক্রীতদাস। বলা বাহুল্য যে, নেই তাদের কোন রাজনৈতিক অধিকারও।

চা শ্রমিক ইউনিয়নের সূত্র মতে, দেশে এমুহূর্তে চা জনগোষ্ঠী প্রায় সাত লাখ। এটা নির্ভরযোগ্য কোন সূত্র দ্বারা যাচাই করা যায়নি। তবে নিবন্ধিত শ্রমিক আছেন ৯৪ হাজার। অনিয়মিত শ্রমিক আছেন আরও ৪০ হাজার। বাগানগুলোতে শ্রমিকদের নতুন নিবন্ধন নেয়া হচ্ছে না। ফলে বেকারত্ব বাড়ছে।

একজন চা শ্রমিকের সাপ্তাহিক বেতন ৭১৪ টাকা। সঙ্গে সপ্তাহে দেওয়া হয় বাজার দরের চেয়ে তুলনামূলক কম দামে ৩ কেজি ২৭০ গ্রাম চাল বা আটা। মুশকিল হলো, ৫-৬ সদস্যের অনেক পরিবার আছে যেখানে ১ জন কাজ শেষে পাচ্ছে ১০২ টাকা আর বাকিরা এই টাকার উপর নির্ভর করেই দিন চালাচ্ছে। ছোট ভাঙাচোরা ঘরে থাকতে হয় গবাদি পশুসহ সন্তানদের নিয়ে। বাগান কর্তৃপক্ষের ঘর মেরামত করে দেওয়ার কথা থাকলেও তা হয় না বছরের পর বছর। চা শ্রমিকদের নেই নিজস্ব কোনো জায়গা। বাগানে কাজ না করলে থাকার জায়গাও হারাতে হবে। তাই শোষণমূলক শর্তেই বাগানে পড়ে থাকে শ্রমিক জনগোষ্ঠী। একজন শ্রমিক বলছিলেন, 'সপ্তাহে ৭১৪ টাকা পাই। কয় টাকায় চাল কিনবো, তারপরে তেল, সাবান, বাচ্চাকাচ্চাদের লেখাপড়া। অনেক কষ্টের মধ্যে এখানে মানুষ চলে, তারপরেও লেখাপড়া করাতে হয় বাচ্চাদের।'

স্বাধীন দেশের প্রায় পাঁচ দশক হতে চললেও চার পুরুষের ভিটেয় চা শ্রমিকদের কেন কোন আইনি অধিকার হলো না তার কোন উত্তর জানে না কোন শ্রমিক। দেশে অনেক খাসজমিও ভূমিহীনদের বরাদ্দ দেয়া হলো। চা শ্রমিকরা কেন কিছু পাচ্ছে না সেটাও অজ্ঞাত। ২০১৮ থেকেই বাগানগুলোতে ভূমি অধিকারের প্রশ্নটি শ্রমিকদের মাঝে বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। ২০১৯-এও সেই ধারাবাহিকতা অব্যাহত ছিল।

লেবার লাইনে ৭ ফুট বাই ১৪ ফুট ঘরে শ্রমিক পরিবারগুলোর বাস। আজও 'মালিক' চাইলেই বাগান থেকে যে কোন শ্রমিককে তুলে দিতে পারে, আর একবার যদি কেউ চা বাগান থেকে উচ্ছেদ হন তবে এ জগতে মাথা গোজার ঠাঁই মেলে

না কোথাও। চা বাগানমাত্রই যে শিশু ভূমিষ্ঠ হচ্ছে তার কোন স্থায়ী ঠিকানা নেই, অনিশ্চিত তার ভবিষ্যৎ। অথছ চা অঞ্চলের জমিতেই ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে আরেক অদ্ভুত প্রকল্প– যার নাম 'টি-ট্যুরিজম'। চা বাগানের আশপাশের বিভিন্ন রিসোর্ট তারই স্বাক্ষ্য বহন করছে। এই 'টি-ট্যুরিজম'-এ অনেক জায়গা যাচ্ছে। ফলে চা শ্রমিকদের কাজের ক্ষেত্র যেমন সংকুচিত হচ্ছে– তেমনি আসন্ন সময়ে শিকার হবেন তারা ভোগবাদী সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের।

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল তাদের সাম্প্রতিক এক প্রকাশনায় উল্লেখ করেছে– বাংলাদেশে চা বাগানের জন্যে বরাদ্দকৃত বিপুল জমির মধ্যে মাত্র ৬৫,২১৭ হেক্টরে চা চাষ হয়। বাকি জমি ক্ষেতল্যান্ড, কারখানা, শ্রমিক বস্তি, পতিত জমি ইত্যাদি চা বাগানের আনুষঙ্গিক কাজে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এই পুরো জমিটাই সরকারি জমি। শুধু চা বাগান করার শর্তে দীর্ঘ মেয়াদি লীজ (৩০-৯৯ বছর পর্যন্ত) এর মাধ্যমে তা মালিকদের বরাদ্দ করা হয়। আইন অনুযায়ী কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সাধারণত ৬০ বিঘার উর্ধ্বে জমি রাখতে না পারলেও চা বাগানের জন্যে তা শিথিল করা হয়েছে, কিন্তু এ সীমা সর্বোচ্চ কতটুকু তাও নির্ধারণ করা হয়নি। এদিকে কৃষি ও অকৃষি জমির জন্যে যে উন্নয়ন কর ধার্য্য করা হয়েছে তাও চা বাগানের জন্যে কার্যকর নয়। বরং চা বাগানের জন্যে তা স্বতন্ত্র, প্রতি শতাংশে ১.১০ টাকা হারে রাখা হয়েছে। আবার কোন বরাদ্দকৃত জমির অল্প কিছু অংশ যদি শিল্প বা আবাসিক কাজে ব্যবহৃত হয় তবে সম্পূর্ণ জমিটাকেই শিল্প-বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহৃত জমি হিসাবে ধরে উন্নয়ন কর নির্ধারিত হবে, কিন্তু চা বাগানের বরাদ্দকৃত জমি তারও অন্তর্ভুক্ত নয়।

তাই এটা খুব স্বাভাবিক যে ভূমি সংক্রান্ত প্রশ্নে সারাদেশের প্রচলিত ধারণা আর চা বাগানের ধারণা এক নয়। সঙ্গত কারণেই চা শ্রমিকদের বসতভিটা, কৃষি জমি কোন কিছুই না থাকলেও দেশের প্রচলিত আইনে সরাসরি তারা ভূমিহীন নন। ভূমি ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়ালের ৫৩ ধারায় ভূমিহীনের সংজ্ঞা নির্ধারণ করা হয়েছে এভাবে '(ক) যে পরিবারের বসতবাটি এবং কৃষি জমি কিছুই নাই, কিন্তু পরিবারটি কৃষি নির্ভর/ (খ) যে পরিবারের বসতবাটি আছে কিন্তু কৃষিজমি নাই অথচ কৃষি নির্ভর/ (গ) যে পরিবারের বসতবাটি এবং কৃষিজমি উভয়ই আছে কিন্তু তার মোট পরিমাণ ০.৫০ একরের কম অথচ কৃষি নির্ভর' এবং এখানে কৃষি নির্ভর বলতে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে অন্যের জমিতে শ্রমিক হিসেবে বা বর্গা চাষি হিসেবে কাজ করে। এই সংজ্ঞা হিসেবে চা শ্রমিকরা যে কাগজের ভাষায় ভূমিহীন নয়, তা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। কিন্তু ভূমি ম্যানুয়ালের ৮ম অধ্যায়ের ১৬০তম ধারায় বলা হচ্ছে 'চা বাগান, রাবার বাগানকর্তৃক যান্ত্রিক পদ্ধতিতে চাষাবাদের ক্ষেত্রে কৃষি জমির

এই উর্ধ্বসীমা প্রযোজ্য হইবে না।' এখানে স্পষ্টতই চা বাগানের জমিকে 'কৃষিজমি' বলা হচ্ছে। চা বাগানের জমি যদি 'কৃষিজমি' হয় তবে চা শ্রমিকরাও ভূমিহীন। বাংলাদেশ সরকার সরাসরি চা শ্রমিকদের ভূমিহীন স্বীকার না করলেও শেষ পর্যন্ত অস্বীকার করতে পারেনি। কিন্তু তাদের ভূমিহীনতা ঘোচাতেও কিছু করেনি।

ইদানিং বাগানগুলোতে শিক্ষার আগ্রহ তৈরি হলেও শিক্ষা সুবিধা অপ্রতুল। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ ৬৪টি চা বাগানের উপর পরিচালিত তাদের এক গবেষণা শেষে ২০১৮-এ দেখায়– বিধিমালায় শ্রমিক সন্তানদের বিনামূল্যে প্রাথমিক শিক্ষাদানের জন্য একটি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথা থাকলেও মাত্র ২৪টি বাগানে বাগান কর্তৃপক্ষের স্কুল দেখেছে তারা। ৪০টি বাগানে বাগান কর্তৃপক্ষের নিজস্ব কোনো স্কুল নেই। ৬টি বাগানে কোনো স্কুলই নেই।

শ্রমিকদের চিকিৎসার জন্য প্রত্যেক বাগানে হাসপাতাল বা ডিসপেনসারি থাকার নিয়ম থাকলেও জরিপকৃত ৬৪টি বাগানের মধ্যে ১১টি বাগানে চিকিৎসা কেন্দ্র বা ডিসপেন্সারি ছিল না। বিধিমালায় অভ্যন্তরীণ ও বহির্বিভাগ– উভয় ধরনের চিকিৎসাসেবার কথা উল্লেখ থাকলেও ৪১টি বাগানের চিকিৎসাকেন্দ্রে ইনডোর চিকিৎসা সেবার ব্যবস্থা পাওয়া যায়নি।

প্রাথমিক স্কুল আগের চেয়ে বাড়লেও ক্লাস বা পড়াশোনার কোনো গুরুত্ব থাকে না সেসব স্কুলে। শিক্ষক থাকে হয়তো একজন। তাকে দিয়ে বাগান কর্তৃপক্ষ অন্য কাজ করান। তাছাড়া দুই-তিনশ জন শিক্ষার্থীকে এক বা দুইজন শিক্ষক দিয়ে পড়ানো সম্ভব হয় না।

সাক্ষাৎকার

‘বাগানে শিক্ষিতরা কাজ পাচ্ছে না’

প্রভারাণী বাড়াইক
চা শ্রমিক ইউনিয়নের প্রাক্তন কর্মী

আপনি চা শ্রমিক জনগোষ্ঠীর মাঝে উন্নয়নধর্মী কাজ করছেন। একসময় চা শ্রমিক ইউনিয়নে কর্মী ছিলেন। এখন শ্রমিক জনপদেই উন্নয়নধর্মী কাজ করছেন। এসব কাজ করতে যেয়ে কী ধরনের পরিবর্তন দেখছেন বাগানে?

একটা উন্নতি হয়েছে, আগের মতো আর বাগানে কোন উন্নয়নধর্মী কাজ করতে অনুমতির ঝামেলা পোহাতে হয় না। আগে একটা স্কুল চালানোও অনেক কঠিন করে তোলা হতো। ম্যানেজারের অনুমতি, ইউনিয়ন পরিষদের অনুমতি পেতে অনেক কষ্ট হতো। এখনও এরকম অনুমতি লাগে বটে– কিন্তু পাওয়া সহজ। ফলে সহজে কিছু করা যায়।

শ্রমিকদের মাঝে কোন ইতিবাচক পরিবর্তন দেখছেন?

শিক্ষার প্রতি আগ্রহ তৈরি হয়েছে অনেক। শ্রমিকরা নিজেরা যত দুঃখকষ্টেই থাকুন, বাচ্চাদের পড়াতে আগ্রহী। এছাড়া মেয়েরা তাদের অধিকার সম্পর্কে অনেক বেশি জানে বুঝে এখন। যদিও সেই অধিকারের চর্চার কাঠামোগত সুযোগ কম। কিন্তু জানাবোঝা অনেক বেড়েছে। আগে তো কথাই বলতে চাইতো না তারা। এখন শহরতলীর কাছের বাগানগুলোতে নারীরা বেশ সচেতন হয়েছে।

আপনারা কী ধরনের কাজ করছেন?

খুব ছোট সংস্থা আমাদের। কাজও ছোট ছোট। যেমন আমরা স্যানিটেশন বিষয়ে সচেতনতামূলক কাজ করেছি। তামাক খাওয়া বন্ধে চেষ্টা করেছি। বাচ্চাদের স্কুল চালিয়েছি। দরিদ্র মায়েদের আর্থিকভাবে উঠে দাঁড়াতে কিছু প্রশিক্ষণের ব্যাবস্থা করেছি।

বাগানে কোন কোন সমস্যাগুলো বেশী তীব্র?

পানির সমস্যা, থাকার সমস্যা। শুকনো মৌসুমে কোথাও গেলেই দেখবেন, একটা টিউবয়েল আর তার চারপাশে অনেক বালতি, কলসী। মানুষের তুলনায় কলের সংখ্যা খুব কম। অনেক বাগানে পর্যাপ্ত ল্যাট্রিনও নাই। এছাড়া শ্রমিক পরিবারগুলোর থাকার জায়গা খুব ছোট। একটা ঘরেই ৫-১০ জন করে আছেন। ঘর বাড়ানো সহজ নয়। অনুমতি লাগে। আবার ঘর করার মতো অর্থ পাবে কোথায়? আয় তো সবার কম।

শিক্ষিতের হার বাড়ায় আয় রোজগার কী বেড়েছে?

প্রাথমিক শিক্ষায় হার যতটা বেড়েছে– উচ্চশিক্ষায় ততটা বাড়েনি। আর শিক্ষিতরা তো কাজ পাচ্ছে না তেমন। অনেক শিক্ষিত বেকার। অনেক মেয়ে প্রাইমারি ও মাধ্যমিকের পর টাকার অভাবে আর পড়তে পারে না। আবার যারা অনেক কষ্টে কলেজ শেষ করতে পারে তারা কী করবে? কাজ তো নেই তেমন। তাই বিয়ে হয়ে যাচ্ছে।

শ্রমিক ইউনিয়ন কী করছে?

মূলত দুই বছর পরপর নির্বাচন করে। মে দিবস পালন করে। আর মজুরি নিয়ে কয়েক বছর পরপর চুক্তি হয়।

পরিবারগুলো আর্থিক সংকট সামলায় কীভাবে?

পরিবারের কেউ না কেউ বাগানের বাইরে যায় কাজ করতে। এমনকি এখন মেয়েরাও যায়। অনেকে বাগানের বাইরে বড়লোকদের বাসাবাড়িতেও কাজ করছে। ছেলেরা অনেকে শহরে কাজ নেয়– যা পায়।

মাদকের সমস্যা কমেছে কী?

এখন তো বাগানের মানুষের চেয়ে বাইরের মানুষ আসে বেশি মদ খেতে। শহরের কাছের বাগানগুলোতে সন্ধ্যা হলেই এরকম মানুষদের দেখবেন আপনি।

শ্রমিক কল্যাণ তহবিল: একটি ভালো উদ্যোগের সুফল পাচ্ছে না শ্রমিকরা

'কে টাকা পেল, কোথায় গেল– এগুলো নিয়ে অনেক সন্দেহ আছে'
- সংসদ সদস্য ইসরাফিল আলম

বাংলাদেশে শ্রমিকদের জন্য একটা ভালো রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ হলো শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন। শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইনটি তৈরি হয় ২০০৬ সালে। আইন অনুযায়ী, দেশে নিবন্ধিত ও সক্রিয় এক কোটি টাকার সম্পত্তি ও ২ কোটি টাকার বেশি মূলধনী প্রতিষ্ঠানের এক বছরের নিট লভ্যাংশের ৫ শতাংশের মধ্যে শতাংশ অর্থ নিজ কোম্পানির শ্রমিকদের জন্য বরাদ্দ থাকে। বাকি এক শতাংশের অর্ধেক প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব শ্রমিক কল্যাণ তহবিলে এবং বাকি অর্ধেক শ্রম মন্ত্রণালয়ের অধীন শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের তহবিলে জমা দিতে হয়। এ তহবিল থেকে প্রাতিষ্ঠানিক, অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত শ্রমিকদের কল্যাণে অর্থ সহায়তা দেয় সরকার। তৈরির পরের বছর থেকেই আইনটির কার্যকারিতা চালু হয়। অর্থাৎ তহবিলে অর্থ জমার প্রক্রিয়া শুরু হয়। আইনে শ্রমিক ও শ্রমিক পরিবারগুলোর জন্য সহায়তা হিসেবে মৃত্যু, চিকিৎসা ও সন্তানের শিক্ষা– এই তিন ক্যাটাগরিতে ২৫ হাজার থেকে সর্বোচ্চ ৩ লাখ টাকা পর্যন্ত সহায়তার বিধান রয়েছে।

কিন্তু কয়েকটি কারণে শ্রমিকরা এই আইন ও তহবিল থেকে প্রত্যাশিত সুবিধা পাচ্ছে না। সমস্যাগুলোর মধ্যে রয়েছে অনেক কোম্পানি কর্তৃক তহবিলে অর্থ জমা না দেয়া। আবার জমাকৃত অর্থ দ্রুত বিলিবন্টন না হওয়া এবং বিলিবন্টনে ধীরগতিও দুর্নীতির অভিযোগ।

দৈনিক দেশ রূপান্তরে ২০১৯-এর সেপ্টেম্বরে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে দেখা যায়, শ্রমিক কল্যাণ তহবিলে অর্থ দেয়ার জন্য ২৮ হাজার প্রতিষ্ঠান তালিকাভুক্ত হলেও মাত্র ১৪০টি কোম্পানি এপর্যন্ত অর্থ জমা দিয়েছে। শুরুর পর থেকে ২০১৯-এর সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তহবিলে জমা পড়েছে ৩৮৩ কোটি টাকা। এ টাকাও শ্রমিকদের মাঝে বিলি-বন্টন করে দেয়ার পরিবর্তে মূল অংশ রাষ্ট্রায়ত্ত বিভিন্ন ব্যাংকে এফডিআর করে রাখা হয়েছে বলে জানা যায়। সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী তহবিলের ৩২৮ কোটি টাকাই এফডিআর করা আছে। মূল হিসাবে আছে মাত্র ৫৫ কোটি টাকা।

এভাবে যখন তহবিলের অর্থ বিভিন্নভাবে জমা পড়ে আছে– তখন অন্যদিকে, সহায়তার জন্য আবেদন জানিয়ে বছরের পর বছর অপেক্ষা করেও সহায়তা পাচ্ছেন না দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু, কর্মহীন ও অসুস্থতার কারণে আর্থিক সমস্যায় জর্জরিত শ্রমিক ও তাদের স্বজনরা। এমনকি চিকিৎসার জন্য সহায়তা চেয়ে আবেদন করে সহায়তা পাওয়ার আগেই অনেকে মারা যাচ্ছেন– কিন্তু তহবিলের অনুদান মিলছে না। সাংবাদিকদের অনুসন্ধানে এও জানা যায়, অনেক শ্রমিক তহবিল থেকে অর্থ পাওয়ার জন্য দেড়-দু' বছর আগে আবেদন করেও সহায়তা পাননি। ফাউন্ডেশন তাদের এই না পাওয়ার কোন কারণও অবহিত করেনি।

ফাউন্ডেশনের বৈঠকও নিয়মিত নয়। সংসদীয় কমিটির কাছে মুক্ত গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি রানী খানের দেওয়া অভিযোগে জানা যায়, শ্রমিক কল্যাণ ফান্ড দ্রুত গঠন করা হলেও অনুদানের টাকা শ্রমিকদের হাতে পৌঁছে অনেক দেরিতে। ফলে তা সঠিকভাবে শ্রমিকের কল্যাণে আসে না। তিনি জানান, বাচ্চা পেটে নিয়ে আবেদন করেন নারী শ্রমিকরা, সেই বাচ্চা অনেক বড় হয়ে গেলেও অনুদানের টাকা হাতে আসে না। অনেকে অসুস্থ হওয়ার পর আবেদন করলেও টাকা পায় সুস্থ হওয়ার পর। আবার ঢালাওভাবে আবেদন বাতিল করা হয় বলেও তিনি অভিযোগ করেছেন।

এসব বিষয়ে আলোচ্য এই ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক ডা. এ এম এম আনিসুল আউয়াল দেশ রূপান্তরকে জানিয়েছেন, ২০১২ সাল থেকে এ তহবিলের সহায়তা পেয়েছেন ৯ হাজার ৯ জন শ্রমিক। আর সহায়তার পরিমাণ ৩১ কোটি টাকা। তবে প্রতি বছর আবেদন পড়ে প্রায় ১০ হাজার এবং অর্থও জমা পড়ছে ক্রমে অধিক হারে।

হিসাব করলে দেখা যায়, দেশের প্রায় সাড়ে ছয় কোটি শ্রমিকের বিপরীতে যে পরিমাণ আবেদন জমা পড়ছে তা একেবারেই সামান্য। সেসব আবেদনেরও অতি সামান্যই সহায়তা পাচ্ছে।

শ্রমিক অধিকার নিয়ে সক্রিয় সংগঠন 'সেইফটি এন্ড রাইটস সোসাইটি'র নির্বাহী পরিচালক সেকেন্দার আলী মিনা জানিয়েছেন, 'যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে তাদের সংগঠন গত কয়েক বছরে ৫০ জন শ্রমিকের জন্য সহায়তার আবেদন করেছিলেন। এর মধ্যে সহায়তা পেয়েছেন মাত্র দু'জন।

২০১৫-১৬ অর্থ বছরে মৃত ২ জন এবং চিকিৎসার জন্য ৩৫ শ্রমিক আর্থিক সহায়তা পান। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এ সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় মৃত ১৭১ ও চিকিৎসা খাতে ৪৬৯ জন এবং শিক্ষা সহায়তার জন্য ২৮১ জন। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে মৃত ৬৬ শ্রমিক ও অসুস্থ ১ হাজার ৫২ জন চিকিৎসার জন্য আর্থিক সুবিধা লাভ করে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মৃত ১২৬, চিকিৎসার জন্য ৩ হাজার ৪২২ এবং শিক্ষার জন্য ২৮২ জনকে আর্থিক সহায়তা দেয় শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন। এইরূপ কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

বাকিদের ব্যাপারে বহুবার যোগাযোগ করা হলেও ফাউন্ডেশন কোনো সদুত্তর দেয়নি।' এসব বিষয়ে ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক আনিসুল আউয়াল বলেন, 'দুই তিন বছর আগের আবেদন এখন দেখার সুযোগ নেই। কাগজপত্র উইপোকায় খেয়ে ফেলেছে। প্রতিদিন আবেদন আসতে থাকে। এসব আবেদনের ৩০ শতাংশ ভুয়া।'

অন্যদিকে, শ্রমিক নেতারা জানিয়েছেন, প্রতি তিন মাস অন্তর পরিচালনা পর্ষদের সভা হওয়ার কথা। সেখানে যাচাই-বাছাই শেষে চূড়ান্ত হওয়ার কথা কাদের সহায়তা দেওয়া হবে এবং কাদের দেয়া হবে না। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে তিন মাস পর পর সভা করতে পারছে না পর্ষদ।

সহায়তা পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রক্রিয়াগত সমস্যার কথাও জানিয়েছেন শ্রমিকরা। আবেদনপত্রের সঙ্গে ইউনিয়ন চেয়ারম্যান থেকে শুরু করে অনেক ব্যক্তির স্বাক্ষর সংযুক্ত করতে হয়। যা অনেক সময় ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিক পরিবারগুলোর পক্ষে সহজে সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না।

শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন পরিচালনা পর্ষদের সদস্য ও বাংলাদেশ লেবার ফেডারেশনের সভাপতি শাহ মো. আবু জাফর এসব বিষয়ে সংবাদকর্মীদের কাছে অভিযোগ তুলেছেন, 'ফান্ডের ভেতরে অনেক অনিয়ম আছে। দালালচক্র অনেক শক্তিশালী। সিল স্বাক্ষর নকল করে যার-তার নামে টাকা তুলে নেয়। প্রশাসনের অনেক কর্মকর্তা মিথ্যা লোক সাজিয়ে টাকা তুলে নিচ্ছে। এতে প্রকৃত শ্রমিকরা বঞ্চিত হচ্ছে। বোর্ড মিটিংয়ে আমরা প্রস্তাব দিয়েছিলাম যারা টাকা পাচ্ছে তারা আসলে ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিক কি না– তা তদন্তের জন্য। কিন্তু বিষয়টি নিয়ে অনেকে দ্বিমত করেছেন। ফলে যে উদ্দেশ্যে তহবিল করা হয়েছিল তা সফল হয়নি।'

শ্রমিক কল্যাণ তহবিলের নানা অভিযোগ নিয়ে কাজ করছে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির ১ নম্বর সাব-কমিটি। সংসদ সদস্য ইসরাফিল আলমকে আহ্বায়ক করে গঠিত ওই সাব-কমিটি এরই মধ্যে বিষয়টি নিয়ে একাধিক বৈঠকও করেছে। মন্ত্রণালয়, ফাউন্ডেশন ও শ্রমিকদের কথা শুনেছেন তাঁরা। ইসরাফিল আলম প্রচারমাধ্যমকে বলেছেন, 'তহবিলের টাকার হকদার দেশের প্রত্যেক শ্রমজীবী হলেও তহবিল সম্পর্কে দেশের ৯০ ভাগ শ্রমিক এখনো কিছুই জানে না। আমরা বলেছি, সহায়তার টাকা ঢাকায় না দিয়ে এলাকায়-এলাকার জনপ্রতিনিধিদের দিয়ে দিতে। এতে শ্রমিকরা তহবিল সম্পর্কে জানতে পারত। কিন্তু এসবের কোনোটাই হয়নি। এত কষ্টে আমরা একটা তহবিল করলাম, টাকাও আছে অনেক, কিন্তু এর বিতরণে স্বচ্ছতা নেই। কে টাকা পেল, কোথায় গেল– এগুলো নিয়ে অনেক সন্দেহ আছে। এতে দেশের বিশাল জনগোষ্ঠী তহবিলের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।'

এক অনুসন্ধানে দেখা যায়, আলোচ্য তহবিল থেকে ২০১২-১৩ অর্থবছরে মৃত ১১১ ও চিকিৎসার জন্য ৪৪ জনকে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়। পরের অর্থবছরে মৃত ৩ ও চিকিৎসার জন্য ৬৭ শ্রমিক অর্থ সহায়তা পান। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে একজন মৃত শ্রমিকের পরিবার ও চিকিৎসার জন্য ৮৬ জনকে সহায়তা দেয়া হয়। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে মৃত ২ জন এবং চিকিৎসার জন্য ৩৫ শ্রমিক আর্থিক সহায়তা পান। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এ সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় মৃত ১৭১ জন ও চিকিৎসা খাতে ৪৬৯ জন এবং শিক্ষা সহায়তার জন্য ২৮১ জন। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে মৃত ৬৬ শ্রমিক ও অসুস্থ ১ হাজার ৫২ জন চিকিৎসার জন্য আর্থিক সুবিধা লাভ করে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মৃত ১২৬, চিকিৎসার জন্য ৩ হাজার ৪২২ এবং শিক্ষার জন্য ২৮২ জনকে আর্থিক সহায়তা দেয় শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন। এইরূপ কার্যক্রম অব্যাহত আছে। আগামীতে আরও বাড়বে বলে আশা করা যায়।

Labor and Employment Scenario 2019: A Summary

1.

It is beyond doubt that workers are the drivers of the economy of Bangladesh. But they are invisible in the discussion, dialogue and decisions of the policy makers as well as in the society. It is a 'dangerous'contradiction. But it is how the primitive accumulation of capital is going on.

This is the reality. According to Transparency International Bangladesh (TIB), the first parliament of Bangladesh was constituted with approximately 17% business persons. But in the tenth parliament, the ratio rises to 59%. SHUJON, a social organization, informed that in the 11th parliament, there are 182 parliamentarians (61.7%) are business person and industrialists.

It is easy to presume that the reverse has happened for the representatives of workers and peasants in the decision-making process. Their representation has decreased in the parliament and other higher levels. As a result, it is easy to understand that, the interest of the workers is the least priority in national policies, laws and enforcement of laws. It also will not be realistic that when the per capita income of the people of the country is 1,952 USD, the worker families will also earn the same. On the contrary, the household census conducted by the Bangladesh Bureau of Statistics (BBS) in

2016, published in 2019, shows that the income gap between the lower 5% and higher 5% is 119%. The non-government source shows it is higher. This gap is widening day by day.

But by the rule of nature and the reality of the economy, workers in the country are growing nonetheless. Workers from Bangladesh are also increasing in abroad. The industry contributes 33.71% in country GDP of which workers are the main force. Approximately, 60 million workers are selling their labour now. Around 2 million are adding in the sector each year of who are mostly unskilled and have very little technical skills. There are also some high and semi high level educated workforce. Though the technical and middle level educated people are getting employed, a large number of highly educated work force are remaining unemployed. The Bangladesh Institute of Development Studies (BIDS) has shown

in a Study in December that 48% of the educated people are employed for fulltime, 18% for part-time and 33% of them are unemployed.

2.

Labour of Bangladesh is mainly divided into two sectors - formal and informal. The volume of the formal sector is small. There are some government instruments and instructions as well as some laws and policies and also have somehow its execution. Workers in formal sector have at least employment letters. As a result, they are relatively better or secured compare to informal sector.

On the other hand, the life and livelihood of the informal sector depend on the whims of the their owners. Due to the influence of politics and assets, they care very little of laws. Amid this anarchy, thousands of workers are joining the sector each year. Owners are taking advantages of the availability of labour force or the large number of workers and as a result the wage is decreasing. Workers' rights and scope of choices are getting little concern. Their right to express demands are also getting narrower. The year 2019 will be recorded in history as a year of 'tranquility' in respect of workers movement. In interviews, the speakers have told unanimously that, 'all regular occupational workers movements are now considered as conspiracy to make the country destabilize.' This means that this tranquility from the worker's side is a kind of imposed peace. The experience of the workers with the newly created law enforcement force to keep 'peace and order' in the industry is not a pleasant one.

But the owner's associations were observed to be hyperactive to increase their financial and other influences. They have expressed their demand without hindrance and have secured them in large from the government. The government has continued incentives for industry. Budget incentives allocated for the garment industry in the year 2019-2020 was BDT 28.25 Billion. The Prime Minister announced in October of continuing the incentives for the leather industry for five more years. But whether these sectors with incentives are getting any special benefits or share for the workers - this information is unavailable. Instead, we will find that the life struggle of the workers of leather or garment industry was not the least easy in 2019.

3.

A large number of the workers of Bangladesh work in abroad. They are indirectly contributing to the GDP of the country. The media has published frequently about their woe and wretchedness in abroad and coming back in the country being dismissed from the job. The present compilation has at least two write-ups featuring the hopelessness of workers working abroad. We don't know about the exact reliable number of migrant workers. This figure varies from 8 million to 10 million. Around 0.8 million workers are going abroad to work each year and 0.1 - 0.2 million of them are returning. This big number of migrant workers is contributing to their own country along with the country they are working in. To be precise, like the previous years, in 2019 the most dependable source for the economy of Bangladesh was the remittance of these migrant workers. Bangladesh receives around 150 million USD remittances per year. The government has announced 2% incentive in the remittance received from the migrant workers in the last budget which means that 2 BDT will be added in per 100 BDT sent by the migrant workers. This announcement has encouraged the migrants to send money through a legal channel. But the women migrant workers in Saudi Arabia have faced frequent turmoil and disgrace last year. This news has come in the national and international media in regular interval. The news of young people from Bangladesh who has tried desperately to enter other countries through boat has also attracted international media. No intention of the intervention was observed to make remedy of these issues.

> The year 2019 will be recorded in history as a year of tranquillity in respect of workers movement.

The much-discussed 'Workers' Welfare Fund' has brought little ease to the distressed workers of the country. We will see that this fund has already accumulated more than 3.83 Billion BDT and it needs a wider implementation. There is another report in this present compilation which shows us that the Labour Court can be more worker friendly through process

reform. Government added three more labour courts in this year with previous seven.

The previous year has not solved the promised universal pension though it was widely expected that the budget would have a specific announcement on this. There was no announcement from the owners and government on garment workers ration. As a result, workers have suffered due to the severe price hike of everyday product at the end of the year. Some products have hiked 500% which have reduced the real income of the workers.

The big industries have seen huge dismissal of workers amidst the growing gap between income and real income. It was the biggest negative incident in the industrial sector in 2019. According to the demand of different sources, only the garment sector has seen a dismissal of 29,000 workers and the closing of 60 factories. According to the BGMEA statement, most of these factories were not compliant.

The Labor scenario of this year has focused on the issues of the construction workers and Rickshaw pullers along with employment issues as well as garment sector. Workers are facing a huge deprivation in the construction sector though it is one of the growing industries in the country. Rickshaw pullers have become a permanent lower class in the urban sphere. A report has focused on the new Transportation Law and consequent workers movements.

A field-based report on Khalishpur Jute mill workers movements is included in the present compilation as a special case.

This compilation has also included reports

on how climate change has devastatingly affected the labour sector.

The primary effect is to be observed on millions of workers who are giving up their traditional professions and becoming floating workers. This condition is especially observable in the agriculture of southern districts. As an effect of increasing salinity, a large number of agriculture labours is losing their job. They are spreading all over the country and causing an observable change in wage and working scope.

Workers dependent on Nature are threatened with income loss due to climate change. For example, fish production is decreasing. Income source of the sweet water fisher-folk, sea-going fisher-folk, coastal fisher-folk families is diminishing. Such a threat is exposed to 10 million fisher-folk of Coxs Bazar alone. Along with this, frequent and long duration flood and waterlogging due to the weak sewerage system in urban area squeeze the work opportunity of people.

Another example of negative effect of climate change as we see fishermen were compelled to abstain from fishing in the sea due to the forecast of a rough sea in the coastal zone. According to Cox's Bazar Fishing boat Owners Association, fishermen were able to fish 5 days in August, 6 days in September and 12 days in October. Such condition has compelled fishermen to give up their profession choosing an alternative like rickshaw pulling, daily labour, etc.

Tidal surge often washes away the only earning source - husbandry, crops, etc of the coastal people. Many marginal peasants become resourceless after losing the crop grown with credit. People earning from industry also lose the source of income.

Safety & Rights

Promoting Safety, Enforcing Rights

১৪/২৩ বাবর রোড (৫ম তলা), ব্লক-বি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭।
ফোন: +৮৮ ০২ ৯১১৯৯০৩-৪, +৮৮ ০১৯৭৪৬৬৬৮৯০
ই-মেইল : info@safetyandrights.org
ওয়েবসাইট : www.safetyandrights.org